বুমেরাং

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

শ্রীগুরু সংস্করণ :
ভাদ্র, ১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

মুদ্রক :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমনোজ চক্রবর্তী

ব্লক প্রস্তুতকারক :
ব্লকম্যান (প্রসেস্)
৭৭।২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
৫০বি, মধু রায় লেন
কলিকাতা ৬

মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

বাংলার মাসিক পত্রিকা
সম্পাদক মহোদয়গণের
করকমলে

"অষ্ট্রেলিয়ান্ বুমেরাং ছোঁড়া শিখি,
নবীন লেখক আমি—
রচনা পাঠাই সম্পাদকের কাছে,
ফিরে আসে পুনরায়
বাঁকা বুমেরাং ঠিক।"

চন্দ্রহাস

শ্রীগুরু সংস্করণ :
ভাদ্র, ১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

মুদ্রক :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমনোজ চক্রবর্তী

ব্লক প্রস্তুতকারক :
ব্লকম্যান (প্রসেস্)
৭৭।২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
৫০বি, মধু রায় লেন
কলিকাতা ৬

মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

বাংলার মাসিক পত্রিকা
সম্পাদক মহোদয়গণের
করকমলে

"অষ্ট্রেলিয়ান্ বুমেরাং ছোঁড়া শিখি,
নবীন লেখক আমি—
রচনা পাঠাই সম্পাদকের কাছে,
ফিরে আসে পুনরায়
বাঁকা বুমেরাং ঠিক।"

চন্দ্রহাস

এই সংগ্রহের একাধিক গল্প বুমেরাং জাতীয়। কিন্তু সন্তানের প্রতি মমতা স্বাভাবিক, তাই আপিলে উহাদের চরম আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। স্থির করিয়াছি, আপিলেও যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে উহাদের ত্যাজ্যপুত্র করিব; অপত্য স্নেহ আমাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ মুঙ্গের

ভেন্‌ডেটা

॥ এক ॥

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

ওলগোবিন্দ ঘোষ ও কুঞ্জকুঞ্জর কর পাশাপাশি জমিদার ছিলেন। উভয়ের নামই বিস্ময়-উৎপাদক। আসল কথা, ওলগোবিন্দবাবু ছিলেন ওলাই চণ্ডীর বরপুত্র; এবং কুঞ্জকুঞ্জরবাবু শাক্তভাবাপন্ন বৈষ্ণববংশের সন্তান।

চারপুরুষ ধরিয়া দুই বংশে কলহ চলিতেছিল। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কুঞ্জকুঞ্জরের বৃদ্ধ পিতামহ ওলগোবিন্দের বৃদ্ধ পিতামহের পুত্রের (অর্থাৎ পিতামহের) বিবাহের বৌভাত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া, নববধূ দেখিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—'ছেলের কথা কিছু বলব না, বাপকা বেটা; কিন্তু ভায়া, বৌ হয়েছে যেন মুক্তোর মালা।'

রসিকতাটি বুঝিতে বরপক্ষের একটু দেরী হইয়াছিল, সেই অবকাশে রসিক ব্যক্তিটি নিজের জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তারপর হইতেই পুরুষ-পরম্পরায় কলহ চলিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে, ওলগোবিন্দের সহিত আদালতে ছাড়া কুঞ্জকুঞ্জরের সাক্ষাৎ হইত না—তাহাও কালেভদ্রে। কিন্তু দেখা হইলে, যুযুধান ষণ্ডের মত উভয়ে ঘোর গর্জ্জন করিতেন!

পার্ষদ ও শুভানুধ্যায়িগণ উভয়কে দূরে দূরে রাখিত।

কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে?

ওলগোবিন্দ একদা দেওঘরে এক বাড়ী খরিদ করিলেন। বাড়ীর চারিধারে প্রকাণ্ড বাগান—পাঁচিলে ঘেরা। বাগানে ইউকালিপ্টাস, ঝাউ পেঁপে কলা—নানাবিধ গাছ।

ওলগোবিন্দ সপরিবারে একদিন হেমন্তকালে নব-ক্রীত বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভারি বাগানের সখ—বাগান দেখিয়া অত্যন্ত হরষিত হইলেন।

পাঁচিলের পরপারে আর একটা বাড়ী; অনুরূপ বাগানযুক্ত। সন্ধ্যাকালে ওলগোবিন্দ দারোয়ান সঙ্গে সেই পাঁচিলের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে পাঁচিলের ওপারে আর একটি মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

তারপর ওলগোবিন্দ ঘোর গর্জ্জন করিলেন।

প্রত্যুত্তরে কুঞ্জকুঞ্জর ঘোরতর গর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু মধ্যে পাঁচিলের ব্যবধান—তাই সেযাত্রা শান্তিরক্ষা হইল।

ওলগোবিন্দ নিজের দারোয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'ভোঁপু সিং, এই বুড্ঢাকো রাস্তামে পাওগে ত টাক ফাটা দেওগে।' বলিয়া ভোঁপু সিংএর হাতে একটি কোদালের বাঁট ধরাইয়া দিলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর নিজের দারোয়ানকে বলিলেন,—'মৃদং সিং, ঐ বুড্ঢাকে রাস্তামে দেখোগে ত ভুঁড়ি ফাঁসা দেওগে।' বলিয়া মৃদং সিং-এর হাতে একটি ভোঁতা খুরপি ধরাইয়া দিলেন।

এইরূপে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া উভয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন। ওলগোবিন্দ নিজের পুত্র প্রিয়গোবিন্দকে বলিলেন—'কুঞ্জ শালা পাশের বাড়ীতে উঠেছে।' কুঞ্জকুঞ্জর নিজ কন্যা সুধামুখীকে বলিলেন,—'ওলা শালা পাশের বাড়ীতে আড্ডা গেড়েছে।'

॥ দুই ॥

স্ত্রীজাতির কৌতূহলের ফলে জগতে অসংখ্য অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ী সম্বন্ধে মেয়েদের কৌতূহল আজ পর্য্যন্ত কেহ রোধ করিতে পারে নাই; বৃথাই অবরোধ-প্রথা, হারেম, ঘোমটা, বোরখার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ওলগোবিন্দের বাড়ীতে তিনটি স্ত্রীলোক;—ওলগোবিন্দের স্ত্রী ভামিনী ও দুই কন্যা। কন্যা দুইটি বিবাহিতা—গিন্নি-বান্নী জাতীয়া। প্রিয়গোবিন্দ তাহাদের কনিষ্ঠ।

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহে তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা সুধামুখীই কেবল অনূঢ়া।

দুই পরিবারের একুনে নয়টি স্ত্রীলোকের কৌতূহল একসঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিল। পাঁচিলের আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি আরম্ভ হইল।

ক্রমে মুখ চেনাচেনি হইল।

ভামিনী অন্যপক্ষের কর্ত্তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন,—'মিন্‌ষের ঝ্যাটার মত গোঁপ দেখলেই ইচ্ছা করে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিই!'

গৃহিণী সম্বন্ধে বলিলেন,—'মরণ আর কি!'

সুধামুখী সম্বন্ধে বলিলেন,—'বেশ মেয়েটি!'

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণীও মত প্রকাশ করিলেন; ওলগোবিন্দ সম্বন্ধে বললেন,—'মিন্‌ষের পেট দেখনা—যেন দশমাস!'

গৃহিণী সম্বন্ধে—'মরণ আর কি!'

প্রিয়গোবিন্দ সম্বন্ধে—'বেশ ছেলেটি!'

তারপর সুগোপনে রমণীদের মধ্যে আলাপ হইয়া গেল। কর্ত্তারা কিছুই জানিলেন না।

কেহ যদি মনে করে, নারীরা স্বামীর শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া

ঘৃণা করে—তবে তাহারা কিছুই জানেনা। হিন্দুনারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু শত্রুপক্ষের নারীদের সঙ্গে গোপনে ভাব করিবার বেলা তাহাদের নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্যই কবি ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—, কি বলিয়াছেন এখন মনে পড়িতেছে না। তবে প্রশংসাসূচক কিছু নয়।

॥ তিন ॥

ওদিকে কর্ত্তারা পরস্পরকে জব্দ করিবার মৎলব আঁটিতেছেন।

উকিল মোক্তার হাতের কাছে নাই, তাই মোকদ্দমা বাধাইবার সুবিধা হইল না। উভয়ে অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জগতে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়, শত্রুর কথা অহর্নিশি চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার ধারাও একই প্রকার হইয়া যায়। তাই পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে ওলগোবিন্দ ও কুঞ্জকুঞ্জর একই কালে একই সঙ্কল্পে উপনীত হইলেন।

গাছ!

বাগান নির্ম্মূল করিয়া দাও!

চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় কিন্তু দেখা গেল ওলগোবিন্দই অগ্রণী! ইহার গুটিকয় কারণ ছিল। প্রথমতঃ ওলগোবিন্দ পুত্রবান—সুতরাং তাঁহার তেজ বেশী। কুঞ্জকুঞ্জর উপর্য্যুপরি পাঁচটি কন্যার পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, ক্রমাগত কন্যা জন্মিতে থাকিলে উৎসাহী ব্যক্তিরও কর্ম্মপ্রেরণা কমিয়া যায়। দ্বিতীয় কথা ওলগোবিন্দকে শত্রুদলন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সাবালক পুত্র ছিল—কুঞ্জকুঞ্জরের তাহা ছিল না।

ফলে, একদিন গভীররাত্রে ওলগোবিন্দ সাবালক পুত্রের হাতে একটি কাটারি দিয়া বলিলেন,—'ঝাউগাছ গুলো!—একেবারে সাবাড় করে দিবি—একটাও রাখবি না।'

কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাটারি হস্তে প্রস্থান করিল। প্রিয়গোবিন্দকে দেখিলে কাসাবিয়ানকার কথা মনে পড়ে। কর্ত্তব্যে কঠোর! The boy stood on burning deck.

॥ চার ॥

পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জকুঞ্জর দেখিলেন, তাঁহার ঝাউগাছগুলি কাৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ ঝাউয়ের মতই কণ্টকিত হইয়া উঠিল; মাথায় চুল ছিলনা বলিয়াই কিছু কণ্টকিত হইতে পাইল না।

তিনি চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিতে লাগিলেন।

তারপর দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—'মৃদং সিং, দেখ্‌তা হ্যায়?'

মৃদং সিং বলিল,—'হুজুর!'

কুঞ্জকুঞ্জর বলিলেন,—'ঐ বুড্‌ঢা কিয়া।'

'আলবাৎ। বে-শক্‌।'

'হাম্‌ভি বুড্‌ঢাকো দেখ লেঙ্গে!'

মৃদং সিং বলিল,—'তাঁবেদার মোজুদ হ্যায়!'

কুঞ্জকুঞ্জর ভাবিলেন, মৃদং সিংকে দিয়াই প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বিবেচনার পর দেখিলেন তাহা উচিত হইবে না। চাকরকে দিয়া বে-আইনী কাজ করানো মানেই সাক্ষীর সৃষ্টি করা। তাহাতে কাজ নাই। যাহা করিবার তিনি নিজেই করিবেন।

ওলগোবিন্দ সে রাত্রি সুখনিদ্রায় যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার কদলীকুঞ্জে কুঞ্জকুঞ্জর প্রবেশ করিয়া একেবারে তচ্‌নচ্‌ করিয়া গিয়াছে। কলাগাছগুলি নিতম্বিনীর উরুস্তম্ভের মত পাশাপাশি পড়িয়া আছে।

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীজয়দেব কবি এদৃশ্য দেখিলে হয়ত একটা নূতন কাব্য লিখিয়া ফেলিতেন। কিন্তু ওলগোবিন্দের চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

তিনিও চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিলেন।

তারপর বাড়ীর ভিতর হইতে বন্দুক আনিয়া দমাদম্ আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জর হটিবার পাত্র নয়। তিনিও বন্দুক আনিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল কিন্তু হতাহতের সংখ্যা শূন্যই রহিল।

বিক্রম প্রকাশ শেষ করিয়া দুইজনে আবার চিন্তা করিতে বসিলেন। ওদিকে স্ত্রীমহলে কি ব্যাপার চলিতেছে কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

॥ পাঁচ ॥

যুদ্ধ-বিগ্রহ একটু ঠাণ্ডা আছে।

কারণ, দুই পক্ষই বন্দুক লইয়া সারারাত বারান্দায় বসিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে আকাশ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়েন।

কিন্তু দুইপক্ষই সুযোগ খুঁজিতেছেন।

ওলগোবিন্দের লক্ষ্য কুঞ্জকুঞ্জরের পুষ্পবর্ষী শিউলি গাছটির উপর।

কুঞ্জকুঞ্জরের নজর ওলগোবিন্দের সুন্দর কৃশাঙ্গী তরুণীর মত ইউকালিপ্টাস গাছের উপর।

একদিন ওলগোবিন্দের স্ত্রী আসিয়া বলিলেন,—'কী ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছ—মিটিয়ে ফেল। সুধা মেয়েটি চমৎকার—প্রিয়র সঙ্গে—'

ওলগোবিন্দ চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—'খবরদার!'

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণী বলিলেন,—'বুড়োয় বুড়োয় ঝগড়া করতে লজ্জা করে না—মিটিয়ে ফেল। প্রিয় ছেলেটি চমৎকার—সুধার সঙ্গে—'

কুঞ্জকুঞ্জর গুম্ফ কণ্টকিত করিয়া বলিলেন,—'চোপরও!'

কিন্তু প্রিয়গোবিন্দ এসব কিছুই জানে না (সুধা জানে)। প্রিয়গোবিন্দ পিতৃভক্ত যুবক, তার উপর কর্ম্মকুশলী। ওলগোবিন্দ যখন কেবল শূন্যে বন্দুক ছুঁড়িতে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রিয়গোবিন্দ সেই অবকাশে শিউলী গাছ কাটিবার উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রিয়গোবিন্দ লক্ষ্য করিয়াছিল যে রাত্রি তিনটার পর কুঞ্জকুঞ্জর আর বন্দুক ছোঁড়েন না। অতএব তিনটার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। প্রিয়গোবিন্দ স্থির করিল, পিতাকে না বলিয়া শেষ রাত্রে অভিযান করিবে। পিতাকে বলিলে তিনি হয়ত তাহাকে বন্দুকের মুখে যাইতে দিবেন না।

সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। ভোর রাত্রে উঠিয়া প্রিয়গোবিন্দ করাত হাতে লইল; তারপর নিঃশব্দে পাঁচিল ডিঙাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের বাগানে প্রবেশ করিল।

জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে; কেহ কোথাও নাই। প্রিয়গোবিন্দ পা টিপিয়া শিউলী গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

শিউলী গাছের তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিল—

॥ ছয় ॥

একটি মেয়ে ফুল কুড়াইতেছে!

প্রিয়গোবিন্দ পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পলাইবার সুবিধা হইল না। সুধাও তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। এবং চিনিতে পারিয়াছিল। প্রিয়গোবিন্দ সুধাকে আগে দেখে নাই।

আমাদের দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোক দেখিলে উকিঝুঁকি মারে এরূপ একটা অপবাদ আছে; মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো অপবাদ নাই, অথচ—

ত্রস্ত সুধা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই ?'

প্রিয়গোবিন্দ করাত পিছনে লুকাইল; বলিল,—'কিছু না।'

সুধা,—'তুমি আমার শিউলী গাছ কাটতে এসেছ!' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রিয়গোবিন্দ স্তম্ভিত হইয়া বলিল,—'মানে—এ গাছ কার ?'

'আমার !'

'মানে—তুমি কে ? এ গাছ ত কুঞ্জর বাবুর !'

'আমি তাঁর ছোট মেয়ে। আমার নাম সুধা।'

'ও—মানে, তা বেশ ত।'

সুধা চক্ষু মুছিয়া বলিল,—'তোমরা কেন আমাদের ঝাউ গাছ কেটে দিয়েছ ?'

প্রিয়গোবিন্দ ক্ষীণস্বরে বলিল,—'আমাদের কলা গাছ—'

'তোমরা ত আগে কেটেছ !'

প্রিয়গোবিন্দ নীরব। সুধার মুখে একটু মেয়েলি চাপা হাসি দেখা দিল। বিজয়িনী! পুরুষ ও-হাসি হাসিতে পারে না।

সুধা আবার আঁচলে ফুল কুড়াইয়া রাখিতে লাগিল; যেন প্রিয়গোবিন্দ নামক পরাভূত যুবক সেখানে নাই!

প্রিয়গোবিন্দ বোকার মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার করাত দিয়া পিঠ চুলকাইল।

শেষে ঢোক গিলিয়া বলিল,—'তুমি রোজ এই সময় ফুল কুড়োতে আসো ?'

সুধা মুখ তুলিয়া বলিল,—'হাঁ—কেন ?'

প্রিয়গোবিন্দের কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল; সে তোৎলাইয়া

বলিল,—'তবে আ-আমিও রোজ এ-ই সময় গাছ কাটতে আসব।' বলিয়া এক লাফে পাঁচিল ডিঙাইয়া পলায়ন করিল।

সুধা আবার হাসিল। বিজয়িনী!

॥ সাত ॥

অন্দরমহলের ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে জটিল হইয়া উঠিতেছে। The plot thickens!

একদিন কুঞ্জকুঞ্জরের কুলপুরোহিত হাওয়া বদলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হঠাৎ ডিস্‌পেপসিয়া হইয়াছে।

ওদিকে কর্ত্তারা রাত্রি জাগিয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাতদিন পরে দু'জনেই ঘুমাইতে গেলেন। মৃদং সিং ও ভোঁপু সিং বাগান পাহারা দিতে লাগিল।

তিন দিন ঘুমাইবার পর দুই কর্ত্তা আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তখন আবার তাঁহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চাগাড় দিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়গোবিন্দ রোজ শেষরাত্রে শিউলী গাছ কাটিতে যাইতেছিল। ওলগোবিন্দ তাহা জানিতেন না; তাই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রিয়গোবিন্দ শিউলী গাছের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ জ্ঞাপন করিয়া জানাইল, ওদিক তাহার নজর আছে; সুবিধা পাইলেই সে শিউলী গাছের মূলে কুঠারাঘাত করিবে।

ওলগোবিন্দ হৃষ্ট হইলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর একজন মন্ত্রী পাইয়াছেন—পুরোহিত মহাশয়। তিনি ইউকালিপ্টাস্ গাছ সম্বন্ধে নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।

পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত সাদাসিধা লোক, তার উপর ডিস্‌পেপসিয়া রোগী; তিনি বলিলেন,—'এর আর বেশী কথা কি! ভাল দিন দেখে কেটে ফেল্‌লেই হল। দাঁড়াও আমি পাঁজি দেখি।'

আমাদের দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোক দেখিলে উকিঝুঁকি মারে এরূপ একটা অপবাদ আছে; মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো অপবাদ নাই, অথচ—

ত্রস্ত সুধা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই?'

প্রিয়গোবিন্দ করাত পিছনে লুকাইল; বলিল,—'কিছু না।'

সুধা,—'তুমি আমার শিউলী গাছ কাটতে এসেছ!' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রিয়গোবিন্দ স্তম্ভিত হইয়া বলিল,—'মানে—এ গাছ কার?'

'আমার!'

'মানে—তুমি কে? এ গাছ ত কুঞ্জর বাবুর!'

'আমি তাঁর ছোট মেয়ে। আমার নাম সুধা।'

'ও—মানে, তা বেশ ত।'

সুধা চক্ষু মুছিয়া বলিল,—'তোমরা কেন আমাদের ঝাউ গাছ কেটে দিয়েছ?'

প্রিয়গোবিন্দ ক্ষীণস্বরে বলিল,—'আমাদের কলা গাছ—'

'তোমরা ত আগে কেটেছ!'

প্রিয়গোবিন্দ নীরব। সুধার মুখে একটু মেয়েলি চাপা হাসি দেখা দিল। বিজয়িনী! পুরুষ ও-হাসি হাসিতে পারে না।

সুধা আবার আঁচলে ফুল কুড়াইয়া রাখিতে লাগিল; যেন প্রিয়গোবিন্দ নামক পরাভূত যুবক সেখানে নাই!

প্রিয়গোবিন্দ বোকার মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার করাত দিয়া পিঠ চুলকাইল।

শেষে ঢোক গিলিয়া বলিল,—'তুমি রোজ এই সময় ফুল কুড়োতে আসো?'

সুধা মুখ তুলিয়া বলিল,—'হাঁ—কেন?'

প্রিয়গোবিন্দের কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল; সে তোৎলাইয়া

বলিল,—'তবে আ-আমিও রোজ এই সময় গাছ কাটতে আসব।' বলিয়া এক লাফে পাঁচিল ডিঙাইয়া পলায়ন করিল।

সুধা আবার হাসিল। বিজয়িনী!

॥ সাত ॥

অন্দরমহলের ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে জটিল হইয়া উঠিতেছে। The plot thickens!

একদিন কুঞ্জকুঞ্জরের কুলপুরোহিত হাওয়া বদলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হঠাৎ ডিস্‌পেপসিয়া হইয়াছে।

ওদিকে কর্ত্তারা রাত্রি জাগিয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাতদিন পরে দু'জনেই ঘুমাইতে গেলেন। মৃদং সিং ও ভোঁপু সিং বাগান পাহারা দিতে লাগিল।

তিন দিন ঘুমাইবার পর দুই কর্ত্তা আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তখন আবার তাঁহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চাগাড় দিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়গোবিন্দ রোজ শেষরাত্রে শিউলী গাছ কাটিতে যাইতেছিল। ওলগোবিন্দ তাহা জানিতেন না; তাই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রিয়গোবিন্দ শিউলী গাছের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ জ্ঞাপন করিয়া জানাইল, ওদিক তাহার নজর আছে; সুবিধা পাইলেই সে শিউলী গাছের মূলে কুঠারাঘাত করিবে।

ওলগোবিন্দ হৃষ্ট হইলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর একজন মন্ত্রী পাইয়াছেন—পুরোহিত মহাশয়। তিনি ইউকালিপ্টাস্ গাছ সম্বন্ধে নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।

পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত সাদাসিধা লোক, তার উপর ডিস্‌পেপসিয়া রোগী; তিনি বলিলেন,—'এর আর বেশী কথা কি! ভাল দিন দেখে কেটে ফেল্‌লেই হল। দাঁড়াও আমি পাঁজি দেখি।'

পাঁজি দেখিয়া পুরোহিত বৃক্ষছেদনের উৎকৃষ্ট দিন দেখিয়া দিলেন; এমন সহৃদয় অথচ ধর্ম্মপ্রাণ সহায়ক পাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

স্থির হইল সোমবার রাত্রি একটার সময় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। গুলি গোলা বন্ধ আছে, ওলগোবিন্দটা নিশ্চয়ই এখনো ঘুমাইতেছে; সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন করিবার এই সময়।

॥ আট ॥

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

বিশেষত নারীজাতি একজোট হইয়া যাহাদের পিছনে লাগিয়াছে তাহাদের জয়ের আশা কোথায়?

রাত্রি একটার সময় কুঞ্জকুঞ্জর করাত লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পাঁচিল পার হইলেন। কিন্তু ইউকালিপ্টাস্ গাছের কাছে যেমনি দাঁড়াইয়াছেন, অমনি ওলগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। কুঞ্জকুঞ্জর করাত দিয়া তাঁহার কান কাটিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। ভোঁপু সিং দারোয়ান তাহাকে পিছন হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

এই ভাবে বুকে-পিঠে আলিঙ্গিত হইয়া কুঞ্জকুঞ্জর বাড়ীর মধ্যে নীত হইলেন। তাঁহাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া, তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অন্য প্রান্ত নিজ হস্তে লইয়া ওলগোবিন্দ আর একটি চেয়ারে বসিলেন। বন্দুক তাঁহার কোলের উপর রহিল।

দুইজনে পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলেন।

চারি চক্ষুর ঠোকাঠুকিতে একটা বিস্ফোরক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেল না, ইহাই আশ্চর্য্য। ওলগোবিন্দ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন—'বুদিনানা অফ্ দি ব্রঙ্কাইটিস্ ইন্টু দি ঘুলঘুলি অফ্ চাটনি কাবাব।

তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা—! গিজিতাক্শিন্!'—তাঁহার উদর জীবন্ত ফুটবলের মত লাফাইতে লাগিল।

কুঞ্জকুঞ্জর কিছুই বলিলেন না।

ওলগোবিন্দ তখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভোঁপু সিংকে বলিলেন,—'প্রিয়কে ডাক!'

প্রিয় আসিল।

ওলগোবিন্দ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—'শিউলী গাছ।'

কাসাবিয়ানকা তৎক্ষণাৎ পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ছুটিল।

॥ নয় ॥

পনের মিনিট কাটিয়া গেল। ওলগোবিন্দ দুই মিনিট অন্তর ফুটবল নাচাইয়া হাসিতে লাগিলেন,—'হিঃ! হিঃ! হিঃ।'

তারপর ওলগোবিন্দ বলিলেন,—'ভোঁপু সিং, থানামে খবর দেও! এই চোট্টাকে জেলমে ভেজেঙ্গে!'

'যো হুকুম' বলিয়া ভোঁপু সিং প্রস্থান করিল।

আরো পনের মিনিট অতীত হইল। ওলগোবিন্দ পূর্ব্ববৎ দু'মিনিট অন্তর হাসিতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জর কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ উভয়ের কর্ণে দূর হইতে একটা শব্দ প্রবেশ করিল—'লু—লু—লু—'

দু'জনে শিকারী কুকুরের মত কান খাড়া করিলেন। শব্দটা যেন কুঞ্জকুঞ্জরের বাড়ী হইতে আসিতেছে।

ওলগোবিন্দ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। দুপুর রাত্রে ও আবার কিসের শব্দ! শেয়াল নাকি? প্রিয় এতক্ষণ ওখানে কি করিতেছে?

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইবারও উপায় নাই—কুঞ্জকুঞ্জর পলাইবে।

এমন সময় ভোঁপু সিং হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল; বলিল, 'আয়্ হুজুর, আপ বৈঠা হ্যায়?'

ওলগোবিন্দ রাগিয়া বলিলেন,—'বৈঠা রহেঙ্গে নেইত কি লাফাঙ্গে? ক্যা হুয়া?'

ভোঁপু সিং জানাইল ও বাড়ীর মাইজী লোগ দাদাবাবুকে পাকড়িয়া লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছে।

দুই কর্ত্তা এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। ওলগোবিন্দের কোল হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল।

ভোঁপু সিং তখনো বার্ত্তা শেষ করে নাই, সক্ষোভে বলিল, উক্ত মাইজীলোগ কেবল দাদাবাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে 'উল্লু উল্লু' বলিয়া গালি দিতেছে।

এই সময় কর্ত্তারা স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন—'উলু—উলু—উলু—'

দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর, যেন একই যন্ত্রের দ্বারা চালিত হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জকুঞ্জরের পায়ের দড়ি অজ্ঞাতসারেই ওলগোবিন্দের হাতে ধরা রহিল।

তাঁহারা যখন কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন ডিসপেপ্‌সিয়া রোগাক্রান্ত পুরোহিত মহাশয় শুভকর্ম্ম শেষ করিয়াছেন।

দুই বাড়ীর গৃহিণীই উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তাদের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের গায়ে হাসিয়া চলিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—'আ মরে যাই! বুড়ো মিন্‌ষেদের রকম ছাখ না! যেন সঙ্!'

সবুজ চশমা

বরদা বলিল,—"আমিও একদিন তোমাদের মত নাস্তিক ছিলুম।"

আমরা সকলে উৎসুকভাবে নিরুত্তর রহিলাম, কারণ, এরূপ ভূমিকার উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল না; কেবল অমূল্য মুখ বিকৃত করিয়া হাসিল।

বরদা টেবিলের উপর হইতে পা নামাইয়া বলিল,—"কিন্তু একবার এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে, তার পর প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব। অনেক দিন আগেকার কথা,—প্রায় দশ বছর হ'ল। সে রকম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও হয় নি। রেলে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলুম।"

অমূল্য সক্ষোভে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল,—"আমাদের ভাগ্যই মন্দ—কাকে দোষ দেব?"

পাছে আবার ঝগড়া বাধিয়া যায়, তাই পৃথ্বী তাড়াতাড়ি বলিল,—"কাউকে দোষ দিতে হবে না। বরদা, তুমি আরম্ভ ক'রে দাও।"

বরদা শত্রুমিত্র সকলকে সমান অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিতভাবে একটা চুরুট ধরাইল, তার পর আরম্ভ করিল,—"কিউল জংসনের মত এমন লক্ষ্মীছাড়া ষ্টেশন বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই। লুপ লাইন থেকে যে দিকেই যেতে চাও কিউলে অন্ততঃ তিনটি ঘণ্টা বিশ্রাম করতে হবে।

সেবার বি, এ পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছিলুম—এলাহাবাদে। সন্ধ্যের সময় মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে রাত্রি আটটা

নাগাদ কিউল পৌঁছুনো গেল। সেখানে পশ্চিমের ট্রেণ আসবে রাত্রি এগারোটায়—সুতরাং অফুরন্ত অবকাশ। আমার সঙ্গে কেবল একটা স্যুট্‌কেস ছিল, সেটা কুলীর জিম্মা ক'রে দিয়ে লম্বা কাঁকর-ঢাকা প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর পায়চারি করতে লাগলুম। ক্রমে ট্রেণ বেরিয়ে গিয়ে ষ্টেশনটা একেবারে খালি হয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আর গাড়ী নেই।

কিন্তু একলা শূন্য প্ল্যাটফর্ম্মে কাঁহাতক পায়চারি করা যায়? ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াবার পর দেখলুম, কেউ কোথাও নেই, ষ্টেশন ষ্টাফও বোধ করি এই অবসরে একটু নিদ্রা দিয়ে নিচ্ছে; গ্যাসের বড় বড় ল্যাম্পগুলো জনহীন প্ল্যাটফর্ম্মে অনর্থক আলো বিকীর্ণ করছে। আমিও এদিক্-এদিক্ চেয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়লুম, ভাবলুম, নিরিবিলি একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।—অ্যাঁ? হ্যাঁ, টিকিট ইণ্টার ক্লাশেরই ছিল।

ওয়েটিং রুমের মাঝখানে একটি বড় গোছের গোল টেবল, তার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্প ঘোলাটে ভাবে জ্বল্‌ছে। টেবলের চারপাশে দশ বারোখানা চেয়ার, আরাম-কেদারাও আছে। একটি চেয়ারে ব'সে এক জন ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছিলেন, একটা চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ তাঁর সামনে টেব্‌লের ওপর রাখা ছিল। আমি ঢুকতেই তিনি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিজের কাছে টেনে নিলেন।

আর কেউ যে ওয়েটিং রুমে আছে, তা প্রত্যাশা করিনি। যা হোক, অনধিকার প্রবেশের সঙ্কোচ দমন ক'রে একটা চেয়ার টেনে বসলুম; ভদ্রলোক মিটমিট ক'রে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। বয়স্থ লোক, মুখে দাড়ি আছে,—ওস্তাগরের তৈরী ঝল্‌ঝলে কোট-প্যাণ্টলুন পরা, কিন্তু তবু বাঙ্গালী ব'লে সন্দেহ হ'ল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম,—'মশায়ের কোন্ দিকে যাওয়া হচ্ছে?'

ভদ্রলোক ব্যাগটি তুলে নিজের কোলের ওপর রাখলেন; এমন

সন্দিগ্ধ-চোখে আমার দিকে চাইতে লাগলেন, যেন তাঁর ঐ ব্যাগটি চুরি করবার জন্যই আমি ঢুকেছি। তার পর সতর্কভাবে বললেন,—'আমি বিলেত যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললুম,—'অ্যাঁ ?'

তিনি আবার বললেন,—'বিলেত যাচ্ছি। আপনি ?'

লজ্জিতভাবে বললুম,—'আমি এই—কাছেই, এলাহাবাদ যাচ্ছি।'

'এলাহাবাদ ? এলাহাবাদ কি করেন ?'

'কিছু করি না—মামার বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি কি কখনও সেখানে ছিলেন ?'

তাঁর সতর্ক সাবধান ভাব অনেকটা কেটে গেল, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—'সেখানে আমি লিটন কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসর ছিলুম—আমার নাম বিরাজমোহন সেন।'

বিরাজমোহন সেন! নামটা খুব পরিচিত, আমার মামাদের মুখে তাঁর অনেক গল্প শুনেছি; মামারা তাঁর কাছে পড়েছিলেন। বিরাজ বাবু এক জন নামজাদা প্রফেসর ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিতে হয়। আমি সচকিত হয়ে উঠলুম, তার পর খুব ভাল ক'রে তাঁকে পর্য্যবেক্ষণ করলুম; কিন্তু তাঁর চেহারায় মাথা খারাপের কোনও লক্ষণই দেখতে পেলুম না। প্রকাণ্ড কপালখানা বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে,—উঁচু বাঁকা নাক, চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু নেই—যা পাগলামি ব'লে মনে করা যেতে পারে। আমি বললুম,—'আমি আপনার নাম শুনেছি—আমার মামারা আপনার ছাত্র!'

'তাই না কি ? কি নাম তাদের বলত।'

আমি নাম বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন,—'শৈল, নীরজ! বিলক্ষণ! তাদের খুব চিনি। তুমি তাদের ভাগ্নে ? বেশ বেশ! বড় খুসী হলুম।' ব'লে তিনি ব্যাগটা আবার টেবলের ওপর রাখলেন।

আমার বড় হাসি পেল, জিজ্ঞাসা করলুম,—'আপনার ঐ ব্যাগটিতে কোনও মূল্যবান জিনিষ আছে—না?'

'মূল্যবান!' তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন,—'হ্যাঁ তা বলতে পার। এমন মূল্যবান্ জিনিষ পৃথিবীতে আর নেই।'

আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম,—'কি জিনিষ?'

তিনি আস্তে আস্তে বললেন,—'একটা চশমা। বিলেতে নিয়ে যাচ্ছি স্যর অলিভর লজকে দেখাব ব'লে।'

আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, বললুম,—'চশমা! স্যর অলিভার লজকে দেখাবেন? কিসের চশমা?'

তিনি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন, মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইলেন তার পর হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

'ভূত?'

'হ্যাঁ—প্রেতযোনি।'

মনে হ'ল মাথা খারাপের কথাটা হয়ত নেহাৎ মিথ্যে নয়; নইলে আপাত-দৃষ্টিতে এমন একজন বিজ্ঞ লোক আবোল-তাবোল কথা কয় কেন? বললাম,—'যা চোখে দেখা যায় না, তা বিশ্বাস করি না।'

তিনি একটু হাসলেন,—'যা চোখে দেখা যায় না, তাই যদি অবিশ্বাস কর, তা হ'লে ত পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিষই অবিশ্বাস করতে হয়। এক বিন্দু জলে লক্ষ কোটি বীজাণু আছে, সে কি চোখে দেখা যায়? মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। এক্সরে দিয়ে জ্যান্ত মানুষের শরীরের গোটা কঙ্কালটা দেখা যায়—শাদা চোখে কি দেখতে পাও?'

আমি বললুম,—'তা পাই না বটে, কিন্তু ভূত যে মাইক্রোস্কোপ কিম্বা এক্সরে দিয়েও দেখা যায় না।'

তিনি আবার হাসলেন, গূঢ় রহস্যময় হাসি। তারপর বললেন,—'তা বটে, কিন্তু শাদা চোখেও যে অনেকে দেখেছে ?'

আমি বললুম,—'তারা হয় ভ্রান্ত, নয় ঠগ।'

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—'পৃথিবীতে সকলকে ভ্রান্ত কিম্বা ঠগের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না—খাঁটি লোকও আছে। শিশির ঘোষ জোচ্চোর ছিলেন না, নির্ব্বোধও ছিলেন না। কিন্তু তোমার এখন বয়স কম, নাস্তিকতাই তোমার বয়সের ধর্ম্ম। আমিও তোমার মতই অবিশ্বাসী ছিলুম—বেশী দিন নয়, দু'বছর আগে পর্য্যন্ত আমি প্রেতযোনি সম্বন্ধে ঘোর নাস্তিক ছিলুম। তার পর হঠাৎ একদিন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। যে অপূর্ব্ব জিনিষ না জেনে আবিষ্কার ক'রে ফেললুম, তাতে জীবনের ধারাটাই বদলে গেল।'

'কি আবিষ্কার করলেন ?'

তিনি কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন,—'একটা চশমা,—বাইনকুলারের লেন্সও বলতে পার।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম,—'সেই চশমাই কি আপনার ব্যাগে রয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

"ঐ চশমাই সার অলিভার লজকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন ?"

'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপার, আমাকে সব বলুন, আমার ভারী কৌতূহল হচ্ছে।'

তিনি বললেন,—'লোকের কাছে ব'লে যে রকম হাস্যাস্পদ আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তাতে কাউকে বল্‌তে ইচ্ছে করে না। যা হোক, তুমি যখন আগ্রহ প্রকাশ করছ, তখন শোনো—

'আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক; বিজ্ঞানের রাজ্যে বাতিক খেয়াল কল্পনার স্থান নেই—সেখানে নীরস নিষ্ঠুর সত্যের কারবার।

সুতরাং ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার মনে যে একটা মজ্জাগত বিরুদ্ধতা থাকবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারবে। ভেবে দেখ, নিসংশয়ে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করা যেতে পারে, এমন জোরালো প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত কিছু পাওয়া গেছে কি? সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া—অনিশ্চিত—বৈজ্ঞানিক কেউ কেউ স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান স্বীকার করে নি। বিজ্ঞান চায় নিরেট স্থূল সত্য, আবছায়া অস্পষ্ট কিছু সে চায় না।

'তাই শিক্ষার গুণে আমিও চিরদিন ভূতপ্রেতকে ঠাট্টাই ক'রে এসেছি—কোনন্ ডয়েল স্যর অলিভার লজ এদের ভ্রান্ত খেয়ালী মনে করেছি,—কখনও ভাবিনি যে, আমিই একদিন অন্যকে বিশ্বাস করাবার জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াব আর তারা আমাকে পাগল মনে ক'রে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস।

'বছর দুই আগে কলেজের ল্যাবরেটারীতে আমি দূরবীণের লেন্স নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছিলুম। একটা বড় সবুজ রংয়ের ক্রিস্ট্যাল এক দিন কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—সেইটে—কিন্তু তুমি বোধ হয় আর্ট ষ্টুডেণ্ট, সব কথা বুঝবে না। মোটামুটি ব'লে রাখি, একটা অদ্ভুত ফিকে সবুজ রংয়ের ক্রিষ্ট্যাল হাতে এসে পড়েছিল; তাই থেকে নিজের হাতে কতকগুলো লেন্স তৈরী করছিলুম। যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে হাতে ক'রে ঘসে ঘসে লেন্স তৈরী করা সহজ কথা নয়, বিস্তর সময় লাগে, তা ছাড়া সব-সময় নির্ভুল হয় না—বাঁকা চোরা থেকে যায়। কিন্তু আমার খেয়াল হয়েছিল, তাই নিজের হাতেই তৈরী করছিলুম।

'একদিন দুপুরবেলা,—তখনও লেন্স সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি,—কেমন হচ্ছে দেখবার জন্যে আমি সেগুলোকে ফ্রেমের ওপর বসিয়ে চোখে পরলুম। চশমার দোকানে চোখ পরীক্ষা করবার সময় যে-রকম ফ্রেম

চোখে পরিয়ে দিয়ে তাতে বিভিন্ন শক্তির কাচ বসিয়ে বসিয়ে পরখ করে, দেখেছ বোধ হয় ?'

আমি ঘাড় নাড়লুম। বিরাজ বাবু বলতে লাগলেন,—'দুপুরবেলা ল্যাবরেটারীতে কেউ ছিল না, আমি দোর বন্ধ করে একা কাজ করছিলুম। কিন্তু চশমা চোখে দিয়ে মুখ তুলেই দেখলুম একজন লোক ঠিক আমার সামনের চেয়ারে ব'সে একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটা সায়েব, টকটকে গোলাপী রং, মুখে ছুঁচোলো দাড়ি। তার অদ্ভুত বেশভূষা,—মধ্যযুগে য়ুরোপীয়রা যে রকম মখমলের জরিদার পোষাক পরত, সেই রকম। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি চশমা খুলে ফেললুম ;—দেখলুম, কেউ কোথাও নেই, চেয়ার খালি।

'খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারলুম না ; তারপর আবার চশমা পরে দেখলুম,—লোকটা বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে চ'লে গেল।'

বিরাজ বাবু চুপ করলেন। আমি রুদ্ধ শ্বাসে প্রশ্ন করলুম, —'তার পর ?'

বিরাজ বাবু বললেন—'এমনই অভাবনীয় এই ঘটনা যে, ব্যাপারটা ভাল করে হজম করতেই কয়েক দিন কেটে গেল। শেষে বুঝলুম ভুল নয় সত্যিই অজ্ঞাতসারে একটা অপূর্ব্ব জিনিষ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি—যার সাহায্যে সূক্ষ্ম দেহও প্রত্যক্ষ করা যায়।

'এ জিনিষ নিয়ে কি করব, প্রথমটা ভেবেই পেলুম না। শেষে ঠিক করলুম আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বলব। তাঁর কাছে গেলুম, একটু উত্তেজিত-ভাবেই আমার আবিষ্কারের কথা বললুম। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন,—'সেন, আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনি কিছুদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করুন।'

'নিরাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলুম। তার পর প্রফেসারদের মধ্যে আমার অন্তরঙ্গ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললুম।

তাঁরাও আমাকে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করবার উপদেশ দিলেন। আশ্চর্য্য আমাদের দেশের লোকের মনোভাব! কেউ একবার জিনিষটা দেখতে চাইলেন না,—একবার বললেন না, দেখি আপনার কথা সত্য কি মিথ্যে।

'মরীয়া হয়ে আমি য়ুনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্সেলারকে এক দরখাস্ত করলুম, তাঁকে সব কথা জানিয়ে লিখলুম যে, তিনি যদি ইচ্ছে করেন, আমি সর্ব্বসমক্ষে ডিমন্‌ষ্ট্রেট্ ক'রে দেখাতে রাজি আছি।

'হপ্তাখানেক পরে আমার চিঠির জবাব এল। ইতিমধ্যে বোধ হয় আমার পাগলামির কানাঘুষো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; ভাইস্ চ্যান্সেলার সাহেব বিনীতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি যদি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার দরখাস্ত করি, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হবে।—রাগের মাথায় কাজ ছেড়ে দিলুম।

'তার পর সারা ভারতবর্ষে যত বিজ্ঞ সুধী আছেন, সকলের দোরে দোরে চশমা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি,—এমন সব লোকের কাছে গিয়েছি—যাঁদের পৃথিবী-জোড়া নাম; কিন্তু সকলের কাছেই এক উত্তর পেয়েছি। কেউ হেসেছেন, কেউ তাড়িয়ে দিয়েছেন, কেউ বলেছেন সময় নেই; কিন্তু আমার কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, তা যাচাই ক'রে দেখবার কৌতূহল কারুর হ'ল না।

'যখন দেখলুম, এ দেশে এই মহামূল্য আবিষ্কারের মর্ম্ম কেউ বুঝবে না, তখন স্থির করলুম—বিলেত যাব। সেখানে অন্ততঃ এক জন লোক আছেন—যিনি প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী—যিনি আমার কথা না শুনে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

'ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। বললে বিশ্বাস করবে না, চশমার ওপর নানারকম অলৌকিক উৎপাত হ'তে সুরু করেছিল। প্রেতলোকের যবনিকা মানুষের চোখ থেকে স'রে

যায়, এটা বোধ হয় তাদের অভিপ্রেত নয়, তাই রোজ চশমাটার ওপর নতুন নতুন দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। কখনও অকারণে হাত থেকে প'ড়ে যায়, কখনও ট্রেণে ব্যাগশুদ্ধ হারিয়ে যায়, কখনও চোরে চুরি করতে আসে—এই ধরণের ব্যাপার। যখনই চশমা চোখে দিই, দেখি, ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, চশমাটা ভেঙে ফেলবার ইঙ্গিত করছে। একবার একটা অদৃশ্য হাত আমার চুল ধ'রে এমন নাড়া দিলে যে, চশমাটা চোখ থেকে ছিটকে মেঝেয় পড়ল। ভাগ্যে কার্পেট ছিল, নইলে সেই দিনই ওটা যেত। যা হোক, অনেক কষ্টে অনেক যত্নে এখন পর্য্যন্ত তাকে অটুট রেখেছি—জানি না, শেষ পর্য্যন্ত স্যর অলিভার লজের কাছে নিয়ে যেতে পারব কি না। এ হচ্ছে যাকে বলে—একটা freak, এর অবিকল নকল কখনও তৈরী হবে না।'

ভদ্রলোকের অত্যাশ্চর্য্য কথাগুলো আমার বদ্ধমূল অবিশ্বাসের গোড়ায় যেন প্রবল নাড়া দিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম,—'আচ্ছা, এই চশমা যে-কেউ চোখে দিলেই ভূত দেখতে পাবে?'

'হ্যাঁ—নিশ্চয় পাবে;—যদিও সে পরীক্ষা করবার সুযোগ আজ পর্য্যন্ত পাই নি। আমি নিজে যতবার পরেছি, ততবারই দেখেছি।'

আমি আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বললুম,—'তা হ'লে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

'নিশ্চয় পারি।'—তিনি সানন্দে ব্যাগটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন,—'দেখাবার জন্যে আমি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কেউ দেখছে না।'

ব্যাগ খুলে তিনি সযত্নে একটি তুলোয় মোড়া চামড়ার কেস্ বার করলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে কেসটি খুললেন। কেসের মধ্যে একটি মজবুত গোছের চশমা—ঠিক চশমা নয়, আজকাল একরকম বাইনকুলার চশমা বেরিয়েছে, অনেকটা সেইরকম দেখতে। সামনে

কতকগুলো সবুজ কাচ লাগানো—তার আশে-পাশে পেতলের স্ক্রু। টর্টইজ-শেলের মোটা-মোটা আর্ম্ম। বিরাজ বাবু উঠে এসে সাবধানে আমার নাকের ওপর চশমাটি বসিয়ে দিলেন।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলুম না—কেবল সবুজ ধোঁয়া। বিরাজ বাবু স্ক্রু ঘোরাতে ঘোরাতে কম্পিতস্বরে বললেন,—'কিছু দেখতে পাচ্ছ? এবার? এবার?'

ক্রমশঃ চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হ'তে লাগল—মনে হ'ল যেন ধোঁয়া আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার পর বায়স্কোপের ছবির মতন স্পষ্ট সব জিনিষ দেখতে পেলুম।

ঘরে কেরোসিনের যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল, তাতে সামান্য আলো হচ্ছিল, কিন্তু চশমার ভেতর দিয়ে দেখলুম,—আলো ঢের বেশী; উজ্জ্বল অথচ মোলায়েম। সে রকম অলৌকিক আলো কখনও দেখি নি—কোথা থেকে আসছে বোঝা যায় না অথচ সর্ব্বত্র সমান ভাবে পড়েছে,—কোথাও ছায়া নেই। আশ্চর্য্য আলো—এইটেই বোধ হয় প্রেত-লোকের দীপ্তি!

কিন্তু আলোর কথা থাক! সেই আলোতে যা দেখলুম, তা ভয়াবহ কিছু না হলেও হৃৎপিণ্ডটা একবার ডিগবাজি খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেখলুম, টেবল ঘিরে প্রত্যেক চেয়ারে একটি ক'রে লোক ব'সে আছেন—তাঁদের পেছনে মাথার পর মাথা, ঘরের মধ্যে তিল ফেলবার যায়গা নেই! আর, সবাই তীব্র নির্নিমেষ চোখে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছেন।

বিরাজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—'দেখতে পাচ্ছ?'

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না, তাই উত্তর দেওয়া হ'ল না। ডান দিকে মাথা ফিরিয়ে দেখি, আমার গা ঘেঁসে একটি প্রেত দাঁড়িয়ে মুখের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে আছেন। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি—ঠিক তাই। আমার মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত

খাড়া হয়ে উঠল, হৃৎপিণ্ডটা আবার সচল হয়ে গলার কাছে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

এঁদের যে কত রকম চেহারা, তা বর্ণনা করা যায় না। সাহেব আছেন, চীনাম্যান আছেন, ভারতীয় লোক আছেন আবার নিকষকান্তি নিগ্রোও রয়েছেন—কোনও ভেদজ্ঞান নাই। একজন শীর্ণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ এবং একটি পালক-দেওয়া টুপী পরা যোলো শতাব্দীর সায়েব পাশাপাশি ব'সে রয়েছেন দেখলুম। সকলেরই দৃষ্টি আমার ওপর—ভাবে মনে হল, কেউ আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন। যেন দাবী জন্মাবার আগেই আমি তাঁদের রাজ্যে ঢুকেছি ব'লে তাঁরা আমার ওপর ভয়ঙ্কর চটেছেন।

ক্রমে তাঁদের মধ্যে একটা আলোচনা সুরু হ'ল দেখলুম; কানে কিছুই শুনতে পেলুম না, কিন্তু মুখ আর হাত নাড়া দেখে আন্দাজ হ'ল যে, খুব উত্তেজিতভাবে তর্ক চলছে—এবং আমি যে এই তর্কের লক্ষ্যবস্তু তাতেও সন্দেহ রইল না। শেষে সেই পৈতে-পরা শীর্ণ ব্যক্তিটি আমার দিকে ফিরে আঙুল দেখিয়ে খুব তীব্রভাবে কি বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোনও ফল হ'ল না, তিনি কি বললেন আমি এক বর্ণও শুনতে পেলুম না।

অনেকক্ষণ বক্তৃতা দেবার পর তিনি টেবলের ওপর একটা নিঃশব্দ চপেটাঘাত ক'রে চুপ করলেন। তখন আবার তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হ'ল।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে দেখতে আমার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলিনি; বলবার দরকারও নেই। তোমরা সহজেই আন্দাজ ক'রে নিতে পারবে। চশমার ভিতর দিয়েই যে এই ভূতের রাজ্য দেখতে পাচ্ছি, চশমা খুলে ফেললে আর দেখতে পাব না, এ কথা সাফ ভুলে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল শাদা চোখেই এঁদের দেখছি। যেন নির্জ্জন মনুষ্যহীন একটা যায়গায়

একপাল ভূতের মধ্যে এসে পড়েছি, তারা আমাকে ঘিরে ব'সে আমার ভাগ্য বিচার করছে।

তাদের তর্কের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হ'ল আমাকে নিয়ে এরা ভীষণ কাণ্ড একটা কিছু বাধাবে। আমার বুদ্ধি বিবেচনা যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল তাদের কাণ্ড দেখে তাও লুপ্ত হয়ে গেল। চশমাটা খুলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যেত, কিন্তু তা না ক'রে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালুম।

অমনি তারাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, তার পরে যেন কি একটা ভয়ঙ্কর সংকল্প ক'রে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে আমার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না, বিকট চীৎকার করে চেয়ার উল্টে ফেলে দরজার দিকে দৌড় মারলুম।

প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছে দৌড়ুতে দৌড়ুতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, তারা তেমনই ভিড় ক'রে আমার পিছনে তেড়ে আসছে। এই সময় একটা বিরাট রৈ-রৈ শব্দ কাণে গেল—'খবরদার!' 'হুঁসিয়ার!' 'ট্রেণ আতা হ্যায়!' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত ট্রেণের ফোঁস ফোঁস হড়্‌হড় শব্দ! ঠিক প্ল্যাটফর্ম্মের কিনারায় পৌঁছে আমি হ্যাঁচকা মেরে নিজেকে সাম্‌লে নিলুম,—গরম এঞ্জিনটা সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে আমার প্রায় নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁচকা দিয়ে নিজেকে সামলালুম বটে, কিন্তু ভারী চশমাটা নাকের উপর থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঠিক লাইনের ওপরে, আর গাড়ীর চাকাগুলো গড়গড় ক'রে সেটাকে গুঁড়ো ক'রে দিয়ে চ'লে যেতে লাগল।

আমার হাতে পায়ে আর জোর ছিল না, অবশভাবে আমি প্ল্যাটফর্ম্মে কাঁকরের ওপরেই শুয়ে পড়লুম। চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছিল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম্ করছিল,—তারই মধ্যে ক্ষীণভাবে

শুনতে লাগলুম, মন্দীভূত ট্রেণের চাকার আর লোহালক্কড়ের শব্দ,—মনে হ'ল, যেন এতক্ষণে সেই প্রেতগুলো সবাক হয়ে আমাকে ঘিরে বিচিত্রস্বরে মহা আনন্দের হাসি হাসছে।

মিনিট কয়েক পরে সংজ্ঞা হ'লে দেখলুম, আমার চারিদিকে অসংখ্য লোকের ভিড় জমে গেছে, আর বিরাজ বাবু পাগলের মত আমার দুটো নড়া ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছেন—আর বলছেন, 'কি করলে —আমার চশমা কৈ? আমার চশমা কৈ? আমার চশমা—'

মূর্চ্ছা যাওয়াই সদযুক্তি বিবেচনা ক'রে আমি আবার মূর্চ্ছিত হয়ে শুয়ে পড়লুম।

বহু বিঘ্নানি

বৌভাতের ভোজ শেষ হইয়া বাড়ীর লোকের খাওয়া-দাওয়া চুকিতে রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল। আজই আবার ফুলশয্যা।

ফাল্গুন মাস ;—অর্দ্ধ-বিস্মৃত সুদূর জনশ্রুতির মত বাতাসে এখনো শীতের আমেজ লাগিয়া আছে। তে-তলার দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটাই নিখিলের শয়নকক্ষ—সেই ঘরেই আজ ফুলশয্যা হইবে। ঘরটি আগাগোড়া ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে। বিছানায় রাশি রাশি সাদা ফুল, মশারির চারিধারে ফুলের মালার ঝালর, খাটের চারিটি ডাণ্ডায় গোলাপ ফুলের মালা লতার মত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে। ঘরে দুটি ইলেকট্রীক বাতি আছে—একটা শাদা, অন্যটাতে লাল বাল্‌ব। দুটিতেই ফুলের দুল দুলিতেছে।

শাদা আলোটা জ্বালিয়া নিখিল দক্ষিণের খোলা জানালার পাশে আরাম কেদারায় বসিয়া ছিল। চোখের সম্মুখে একটা খবরের কাগজ ধরা ছিল,—বাহির হইতে কেহ আসিয়া হঠাৎ দেখিলে মনে করিত সে বুঝি পড়ায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি রসিক, চব্বিশ বছর বয়সে একদা ফাগুনের রাতে যিনি নব-বধূর চরণ-ধ্বনির আশায় উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছেন, তিনি নিখিলের মনের অবস্থা বুঝিবেন। চক্ষুই কাগজে নিবদ্ধ, কিন্তু মন ?—হায়, চব্বিশ বছরের মন !

অধিকন্তু, বধূটি নিখিলের সম্পূর্ণ অপরিচিতা নয় ; চোখে চোখে হাসিতে হাসিতে একটু আলাপ বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। তিন

বছর আগে নিখিলের ছোট বোনের বিবাহের রাত্রে সে প্রথম ললিতাকে দেখিয়াছিল, সেই অবধি—

যে জিনিষ তিন বছর ধরিয়া অহরহ কামনা করা যায়, পরিপূর্ণ প্রাপ্তির শুভলগ্ন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, মুহূর্ত্তগুলি ততই যেন অসহ্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। নিখিল কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া জানালার বাহিরে তাকাইল; দখিনা বাতাস ক্রমেই যেন উন্মাদ হইয়া উঠিতেছে, আর যেন শান্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। একটা পাপিয়ার কণ্ঠ পর্দ্দায় পর্দ্দায় ঊর্দ্ধে উঠিয়া রঙীন আতস বাজীর মত ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িল। পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা! পিঁউ কাঁহা!

বারটা বাজিল। দ্বারের বাহিরে ফিস্ ফিস্ গলার আওয়াজ ও চুড়ি-চাবির মৃদু শব্দ কাণে যাইতেই নিখিল সচকিত ভাবে চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদ পত্রে নিবদ্ধ করিল।

বড় বৌদিদি বধূর হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন —'এই নাও ভাই তোমার জিনিষ।'

নিখিল কাগড় রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বৌদিদি বয়সে তাহার জ্যেষ্ঠা; চিরদিনই নিখিল তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম করিয়া চলে। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বড় বৌদিদি হাসিয়া বধূর হাতটি নিখিলের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিলেন,—'নাও। এবার আমি চললুম।—একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা কোয়ো কিন্তু। সবাই আড়ি পাতবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।' বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে অনেকগুলি চাপা গলার ফিস্ ফিস্ ও তর্জ্জন শুনা গেল —'কেন তুমি বলে দিলে—' বৌদিদি বলিলেন,—'নে, আর ওদের জ্বালাতন করিস্ নি। অনেক রাত হয়ে গেছে; এখন যে-যার নিজের ঘরে গিয়ে ফুলশয্যে করগে যা।'

নিখিলের একটু দুর্ভাবনা হইল। বাড়ীতে গুটি চারেক নবীনা বৌদিদি আছেন, তাঁহারা রেয়াৎ করিবেন না ; দুটি কনিষ্ঠা ভগিনী— না, তাহারাও আজ কোনো বাধা মানিবে না। তাছাড়া একটি পঁয়তাল্লিশ বছরের শিশু ভগিনীপতি আছেন, তিনি ত আগে হইতেই শাসাইয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু বধূর হাতটি নিখিলের মুঠির মধ্যে। ললিতা কম্প্রবক্ষে সন্নতনয়নে দাঁড়াইয়া আছে,—মাথার অনভ্যস্ত ঘোমটা খসিয়া পড়িতেছে। কপালে ঠোঁটের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাহার টানাটানা চোখে কে সরু করিয়া কাজল পরাইয়া দিয়াছে। অপূর্ব্ব হর্ষাবেশে নিখিলের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল! এই নারীটি তাহার! সে ললিতার হাতে একটু টান দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, —'ললিতা!'

ললিতার চোখ দুটি একবার স্বামীর মুখের পানে উঠিয়াই আবার নামিয়া পড়িল ; ঠোঁট দুটি একটু নড়িল,—'আলো নিবিয়ে দাও।'

বধূর হাত ছাড়িয়া নিখিল উজ্জ্বল আলোটা নিবাইয়া লাল আলো জ্বালিয়া দিল। ঘরটি স্বপ্নময় হইয়া উঠিল। জানালা পথে দখিণা বাতাস তখন আরো অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বধূর কাছে ফিরিয়া আসিতেই বধূ একটু হাসিয়া খাটের নীচে আঙুল দেখাইয়া দিল। নিখিল প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া খাটের নীচে উঁকি মারিল। খাটের নীচে বধূর দুটা বড় বড় তোরঙ্গ ছিল, তাহাদের মাঝখানে একটি বড় পুঁটুলির মত বস্তু দেখিতে পাইল। টিপ করিয়া নিখিল পুঁটুলির গোলাকার স্থানটিতে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া ভগিনীপতি বাহির হইয়া আসিলেন। 'উঃ শালা বোম্বাই চড় জমিয়েছে রে!' বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে দরজা খুলিয়া পলায়ন করিলেন।

ললিতা হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখে আঁচল দিল।

জামাইবাবুকে ঘরের বাহিরে খেদাইয়া দিয়া, দ্বারে খিল দিয়া নিখিল ঘরটা ভাল করিয়া তদারক করিল। ওয়ার্ডরোবের দরজা হঠাৎ খুলিয়া দেখিল ভিতরে কেহ আছে কিনা। আর কাহাকেও না পাইয়া সে নিশ্চিত হইয়া বলিল,—'আর কেউ নেই।'

ললিতার হাত ধরিয়া সে শয্যার পাশে লইয়া গিয়া বসাইল। ললিতার পা চলে চলে চলেনা। ঐ পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যাটি চির জন্মের জন্যে তাহার—আর এই লোকটি—জীবনে মরণে সেও তাহার। তবু পা চলে না—পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায়। হায় ষোল বছরের যৌবন! হায় প্রথম-প্রণয়-ভীতি!

বধূর পাশে বসিয়া নিখিল চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল;—'শুভ দৃষ্টির সময় অমন মুখ টিপে হেসেছিলে কেন বলত?'

বাহিরের অশান্ত দখিণা বাতাসটা আর শাসন মানিল না—হু হু করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মশারি উড়াইয়া, আল্‌নার কাপড়-চোপড় ছত্রাকার করিয়া, বধূর বসনাঞ্চল এলোমেলো করিয়া খবরের কাগজের কয়েকটা পাতা সঙ্গে লইয়া আকস্মিক দুরন্ত বিপ্লবের মত উত্তরের জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল!—বসন্তের মাতাল বাতাস—নাহি লজ্জা নাহি ত্রাস—আকাশে ছড়ায় অট্টহাস—

পাগলা বাতাসটা চলিয়া গেল—গোলাপী ছায়াময় ঘরটি আবার নিস্তব্ধ হইল। আলোটা দোল্‌নার মত দুলিতে রহিল।

হাওয়ার এই বিঘ্নকারী উৎপাতে নিখিল মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। বধূকে জিজ্ঞাসা করিল,—'দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ করে দেব নাকি?'

ললিতা মাথা নাড়িল,—'না, থাক।'

নিখিল তখন ললিতার পাশে আরো একটু সরিয়া বসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—'ললিতা!'

ললিতা তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—'ছাড়ো।'

নিখিল ডান হাতে তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—'না ছাড়বো না।'

এই সময় খুব নিকট হইতে ভারী গলায় কে বলিয়া উঠিল, 'খবরদার।'

চমকিয়া নিখিল ললিতাকে ছাড়িয়া দিল; ললিতাও জড়সড় হইয়া সরিয়া বসিল।

নিখিল আবার ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিল, খাটের তলাটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল—কিন্তু কেহ কোথাও নাই। তবে কে কথা কহিল? গলাটা ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিয়াছে—এ জামাইবাবু না হইয়া যায় না। কিম্বা হয়ত সেজ বৌদিদি—তিনি পরের গলা চমৎকার নকল করিতে পারেন। কিন্তু যিনিই হোন্—কোথায় তিনি? দুই জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে কাহাকেও চোখে পড়িল না। দরজায় কান পাতিয়া শুনিল—কাহারো সাড়া শব্দ নাই। ব্যর্থ হইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া ললিতার পাশে বসিল।

ঠং করিয়া সাড়ে বারোটা বাজিল।

নিখিল বলিল,—'বোধ হয় শোনবার ভুল—কিন্তু ঠিক মনে হল, কে যেন বললে—খবরদার। তুমি শুনেছিলে?'

ললিতা বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সেও 'খবরদার' শুনিয়াছিল—লজ্জায় লাল হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয় কেহ দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নিখিল আবার তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল, বলিল,—'ও কিছু নয়।'

ললিতা তাহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া বসিয়া চাপা উৎকণ্ঠার স্বরে বলিল,—'না না, এক্ষুনি কে দেখতে পাবে।'

নিখিল উঠিয়া গিয়া উত্তরের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল—সে-দিকে ছাদ, সুতরাং আড়ি পাতিবার সুবিধা বেশী। দক্ষিণ দিক ফাঁকা—সেদিক হইতে কোনো ভয় নাই—তাই সে জানালাটা খোলাই রহিল।

‘এবার আর কোনো ভয় নেই’ বলিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিখিল ললিতার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার একটি হাত তুলিয়া লইয়া আঙুলের ডগায় একটা চুম্বন করিল। ললিত হাত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। নিখিল হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল,—‘দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী মেয়েটির মত একটি—’ বলিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। ললিতার তপ্তনিশ্বাস তাহার অধরে লাগিল।

ঠিক এই সময় তেম্‌নি ভারী গলায়—‘এই! ও কি হচ্চে?’

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া নিখিল চারিদিকে চাহিল। শব্দটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে তাহা উৎকর্ণ হইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু আর কোন শব্দ শুনা গেল না। নিখিলের মনে হইল শব্দটা যেন ঘরের ভিতর হইতেই আসিতেছে—অথচ ঘরের ভিতর কেহ নাই, সে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছে।

নিখিলের বড় রাগ হইল। বার বার বাধা! কথা যে-ই বলুক, সে নিশ্চয় তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে পাইতেছে—নচেৎ ঠিক ঐ সময়েই—

একটি মলক্কা বেতের লাঠি হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া নিখিল সন্তর্পণে দ্বার খুলিল—ইচ্ছাটা, সম্মুখে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই এক ঘা বসাইয়া দিবে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সেখানে কেহই নাই। তবু নিখিল বাহির হইল—কে বজ্জাতি করিতেছে তাহাকে ধরিতেই হইবে; রসিক লোকটিকে আজ ভাল করিয়া জব্দ করা চাই।

পনের মিনিট বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া নিখিল হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বাড়ী নিশুতি—ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ। চাকর দাসীরা পর্য্যন্ত সমস্তদিনের ক্লান্তির পর যে যেখানে পাইয়াছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৌদিদি প্রভৃতিরা বোধ করি প্রথমে খানিকক্ষণ নিখিলের ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া শেষে প্রবলতর আকর্ষণে স্ব স্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

লাঠিটি ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়া নিখিল বলিল,—'নাঃ, কাউকে দেখতে পেলুম না, সবাই ঘুমিয়েছে।' সে আশ্চর্য্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল—কি এ! ভৌতিক ব্যাপার! ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম্‌?

ঘড়িতে একটা বাজিল।

তখন নিখিল আবার ললিতার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিল। তারপর, কি ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া দক্ষিণের জানালাটাও বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ললিতা মৃদু কণ্ঠে বলিল,—'শুয়ে পড়লে হত না?'

নিখিল কিন্তু এখনি ঘুমাইতে রাজি নয়। বধূর সহিত নব পরিচয়ের রাত্রে, যখন সবেমাত্র পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে—তখন ঘুম!

নিখিল ললিতার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—'এখনি ঘুমুবে? আচ্ছা, আগে একটা চুমু দাও, তারপর বিছানায় শুয়ে গল্প করব।'

'আলো নিবিয়ে দাও।'

'না—আলো থাক। ললিতা—' বলিয়া ঠোঁটের কাছে ঠোঁট লইয়া গেল!

পুনরায় সেই গম্ভীর স্বর—'দাঁড়াও ত মজা দেখাচ্ছি।'

এবার নিখিলের মনটা সতর্ক ছিল। সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তারপর উঠিয়া গিয়া স্বইচ টিপিল।

বড় আলোর আকস্মিক তীব্র দীপ্তিতে ঘর ভরিয়া যাইতেই কার্নিসের উপর হইতে শব্দ হইল,—'রাধে কৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ!'

কার্নিসের দিকে তাকাইয়া নিখিল হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ললিতাও সেদিকে একবার তাকাইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

একটা পাহাড়ী ময়না কার্নিসের উপর বসিয়া আছে এবং গম্ভীর-ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিতেছে।

নিখিল হাসিতে হাসিতে গিয়া ললিতাকে বিছানা হইতে ধরিয়া তুলিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বধূকে শক্ত করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পাখীটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল,—'হতভাগা পাখী! বোধ হয় সেই ঝড়ের সময় কারুর খাঁচা থেকে পালিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। দাঁড়াও ওকে শায়েস্তা করছি।'

এক ঘর আলো—তাহার মাঝখানে স্বামীর একি কাণ্ড! ললিতা তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল,—'ও কি করছ! ছেড়ে দাও—আলো নিবিয়ে দাও।'

নিখিল বলিল,—'না—ও বেটা পাখীকে আমি আজ দেখিয়ে দেব যে ওকে আমি গ্রাহ্য করি না। এ যে আমার নিজের স্ত্রী তা বেটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।' বলিয়া ললিতার ঠোঁটে চোখে কপালে চার পাঁচটা চুম্বন করিল। ললিতাও বিবশা হইয়া স্বামীর বুকের উপর চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

পাখীটা বলিল—'খবরদার! ও কি হচ্ছে! দাঁড়াও ত—'

নিখিল ললিতার নরম গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে বলিল,—'ললিতা, এবার তুমি একটা।'

ললিতার অবশ অঙ্গে একটু সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, 'আলো নিবিয়ে দাও। দুটোই।'

নিখিল বলিল,—'কিন্তু পাখীটা যে দেখতে পাবে না!'

'তা হোক।'

তখন যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেখান হইতে হাত বাড়াইয়াই নিখিল সুইচ টিপিয়া দিল। ঘর একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল।

'ললিতা!'

'কি?'

'আলো নিবিয়ে দিয়েছি।'

মিনিটখানেক পরে একটি ভারি মিষ্টি ছোট্ট শব্দ হইল।

পাখীটা অন্ধকারে তাহা শুনিতে পাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—'রাধেকৃষ্ণ!'

তিমিঙ্গিল

তিমি মৎস্যই যে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব, এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা একমত। আমি কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বলিতে পারি যে, তিমিঙ্গিল নামধারী আর একটি অতি বৃহদায়তন জীব আছে যাহারা তিমি মৎস্যকে গিলিয়া খায়। বিশ্বাস না হয়, অভিধান দেখুন।

অপিচ, তিমিঙ্গিল যদি থাকিতে পারে, তবে তিমিঙ্গিল-গিল (যাহারা তিমিঙ্গিলকে গিলিয়া খায়) থাকিবে না কেন? এবং তিমিঙ্গিল-গিল থাকা যদি সম্ভবপর হয় তবে তিমিঙ্গিল-গিল-গিল থাকিতেই বা বাধা কি?

এই ভাবে প্রশ্নটাকে অনন্তের পথে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনর্থক কতকগুলা গিল-গিল-গিল বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনই লাভ হইবে না। আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, জগতের সর্ব্বত্রই বৃহৎকে বৃহত্তর গ্রাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ —বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুপ্ত মহাশয় বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। রাত্রি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিট সময়ে তিনি হঠাৎ তড়াক্ করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ঘরে আর কেহ থাকিলে মনে করিত, নিশিকান্তবাবু বুঝি বৈদ্যুতিক 'শক্' খাইয়াছেন। হইয়াছিলও তাই। তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চল্লিশ হাজার ভোল্টের প্রচণ্ড একটি আইডীয়া খেলিয়া গিয়াছিল।

নিশিকান্তবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দালাল; ব্যবসা-সম্পর্কীয় সকল বিদ্যার হুনরী। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ক্রয়-বিক্রয়

তেজী-মন্দা বাজার জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ কলিকাতা সহরে বড় কেহ ছিল না। এই সূক্ষ্ম বাজার-জ্ঞানের ফলে গত পঁচিশ বৎসরে তিনি কত লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেহ জানিত না। যাহারা কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁহার চমৎকার সুসজ্জিত দোতালা বাড়ীখানা দেখিত, তাহারা সহিংসভাবে অনুমান করিত মাত্র।

কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাজারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, নিশিকান্তবাবুর চিত্তে সুখ নাই। কাজ কর্ম্ম প্রায় বন্ধ আছে। কারণ কাজ করিতে গেলেও লাভের মাত্রা এত কম হস্তগত হয় যে খরচা পোষায় না। ব্যবসার জগৎটা যেন ধীরে ধীরে প্রলয়পয়োধিজলে ডুবিয়া যাইতেছে।

নিশিকান্তবাবুর অবশ্য অর্থোপার্জ্জনের কোনও প্রয়োজন নাই; ব্যাঙ্ক হইতে ছয় মাস অন্তর যে সুদ বাহির করেন তাহাতে তাঁহার পাঁচটা হাতী পুষিলেও ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হয় না। কিন্তু নিশিকান্ত কর্ম্মী পুরুষ, অর্থোপার্জ্জনের নেশা তিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অভ্যাস করিয়াছেন। তাই, আফিমের মৌতাতের মত উপার্জ্জনের মোহই তাঁহাকে বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। অথচ দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান মন্দার বাজারে উপার্জ্জন একেবারেই নাই।

নিশিকান্ত জগদ্ব্যাপী অবসাদের মধ্যে কোথাও একটু আশার আলো দেখিতে পাইতেছিলেন না, এমন সময়ে রাত্রি এগারো বাজিতে সাতাশ মিনিটে তাঁহার মাথায় চল্লিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

আলোক-বিভ্রান্তের মত নিশিকান্ত কিছুক্ষণ বিছানায় জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল,—মোমবাতি! হ্যারিকেন লণ্ঠন!!

হাত বাড়াইয়া তিনি বেড্-সুইচ টিপিলেন; রক্তবর্ণ নৈশ দীপ

মাথার উপর জ্বলিয়া উঠিল। নিশিকান্ত প্রায় দশ মিনিট মুগ্ধ তন্ময় ভাবে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

বালিশের পাশে তাঁহার নোটবুক ও পেন্সিল থাকিত। নিশিকান্ত বুকের তলায় বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইলেন, তারপর নোটবুকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। নোটবুকের অবোধ্য ইঙ্গিতে তাঁহার ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় গুপ্ত কথা লেখা ছিল, তিনি সেইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। প্রথমে হিসাব করিলেন, কত টাকা তিনি ইচ্ছা করিলেই ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্থান হইতে বাহির করিতে পারেন। হিসাব বোধ করি বেশ মনোমত হইল, কারণ তিনি পরিতোষের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর তিনি নোটবুকের পাতায় পেন্সিল দিয়া আর এক-জাতীয় অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় এটা খরচের হিসাব। সমস্ত যোগ করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশী হইল। নিশিকান্ত খাতা হইতে মুখ তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, তারপর নোটবহি বন্ধ করিয়া বালিশের পাশে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ডিত মুখে দশ হাজার দীপশক্তির যে হাসিটি ফুটিয়া উঠিল তাহার কাছে রক্তবর্ণ নৈশ দীপের প্রভা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

তিনি মনে মনে বলিলেন,—'তিন দিনে বাহাত্তর হাজার টাকা! মানে—রোজ চব্বিশ হাজার।'

নিশিকান্তবাবুর স্ত্রী পাশের ঘরে শয়ন করিতেন, মাঝের দরজার পর্দার ব্যবধান। নিশিকান্তবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ—তবে ভার্য্যাটি নেহাৎ তরুণী নয়, বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। তিনি অত্যন্ত সৌখিন এবং বন্ধ্যা, এই জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ। প্রায়ই মাসিক পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

নিশিকান্তবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, পর্দ্দার নীচে দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। বুঝিলেন, গৃহিণী এখনো মাসিক পত্র শেষ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—'হ্যাগা, জেগে আছ ?'

পাশের ঘর হইতে হ্যাঁগা উত্তর দিলেন,—'হুঁ'।

আলুথালু বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া নিশিকান্ত স্ত্রীর ঘরে গেলেন। স্ত্রী পিঠে বালিশ দিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়াছিলেন, মাথার শিয়রে একটা ত্রিপদের শীর্ষে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। স্ত্রী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া নিশিকান্তবাবুর চেহারা দেখিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিলেন।

নিশিকান্ত আলোর নিকটে গিয়া সুইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিলেন ; আবার জ্বালিলেন, আবার নিবাইয়া দিলেন।

বিরক্তভাবে গৃহিণী বলিলেন,—'ও কি হচ্ছে ?'

নিশিকান্ত বলিলেন,—'বেশ—না ? এই ইলেক্‌ট্রিক বাতি। সুইচ টিপলেই নিবে যায় আবার সুইচ টিপলেই জ্বলে ওঠে।'

স্ত্রী ধমক দিয়া বলিলেন,—'এত রাত্রে হল কি তোমার ?'

নিশিকান্ত স্ত্রীর শয্যার পাশে আসিয়া বসিলেন ; একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—'আমি ভাবছি একটা ছাপাখানা করতে কত খরচ লাগে।'

স্ত্রীর হাত হইতে মাসিক পত্র পড়িয়া গেল। তিনি সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। বহুদিন হইতে তাঁহার বাসনা নিজের ছাপাখানা করিয়া একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন ; মাসিক পত্রে কেবল কবিতা ছাপা হইবে। পত্রিকার নাম হইবে—'মন-কুসুম'—সম্পাদিকা হইবেন স্বয়ং শ্রীমাধুরী দেবী !

স্বামীকে এই সুন্দর পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। কবিতার মাসিক পত্র কিরূপ চলিবে সে-বিষয়ে নিশিকান্তবাবুর মনে কোনো মোহ ছিল না। অথচ স্ত্রীর একটা সখ মিটাইবার ইচ্ছা তাঁহার যে

একেবারেই ছিল না তাহা নয়। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া নিশিকান্ত গা করেন নাই।

মাধুরী দেবী এক নিশ্বাসে বলিলেন,—'সত্যি কিনবে?—আমার কতদিনের যে সখ। 'মন-কুসুম' কেমন নামটি হবে বল ত? নীচে লেখা থাকবে—সম্পাদিকা শ্রীমাধুরী দেবী! খরচ এমন কিছু নয়; সেদিন 'নীলকান্ত প্রেসের' মালিক আমার কাছে এসেছিল। তারা প্রেস বিক্রী করতে চায়, কোথা থেকে শুনেছে আমি কিনতে পারি। খুব বড় প্রেস—ইংরেজী বাংলা সব আছে; নতুন দাম সাতাশ হাজার টাকা। বলছিল আঠার হাজার পেলেই বিক্রী করবে। তা—কষামাজা করলে হয়ত কিছু কমেও দিতে পারে।'

নিশিকান্ত ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'খবর নিও যদি বারো হাজারে ছাড়ে ত নিতে পারি।'

মাধুরী দেবী বলিলেন,—'অত কমে দেবে কি? আচ্ছা—'

নিশিকান্ত শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিলেন। মাধুরী দেবী তাঁহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেন,—'এখনি শুতে চললে?'

নিশিকান্ত আলস্য ভাঙিয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ আর ছাখ, কাল দুই টিন ভাল কেরাসিন তেল আর গোটা দশেক হ্যারিকেন লণ্ঠন কিনে আনিও। আর পাঁচ বাণ্ডিল মোমবাতি।' বলিয়া নিগূঢ় ভাবে হাস্য করিতে করিতে তিনি নিজের শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

অতঃপর সাতদিন ধরিয়া নিশিকান্তবাবুর ভোমরা রঙের সিডান-বডির গাড়িখানি মধু-সঞ্চয়ী মৌমাছির মত কলিকাতার পথে পথে গুঞ্জন করিয়া উড়িয়া বেড়াইল। নিশিকান্তবাবু কোথায় কোথায় গেলেন ও কাহার সহিত নিভৃতে কি কথা বলিলেন তাহা ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্য নয়—সাধ্য হইলেও বলিতাম না। পরের গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া দিতে আমরা ভালবাসি না। এই সব যাতায়াতের ফলে নিশিকান্তবাবুর ব্যাঙ্ক হইতে লক্ষাধিক টাকা অপসৃত হইয়া কোন

মৌচাকে সঞ্চিত হইল তাহাও বলিব না। ঘুঘির পুংলিঙ্গে যে-শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা অত্যন্ত ঘৃণা করি।

তারপর মাল খরিদ আরম্ভ হইল। নিশিকান্তবাবু যে যে মাল খরিদ করিয়া বাজার কোণঠাসা করিলেন তাহার ফিরিস্তি দিবার প্রয়োজন নাই; তিনি বাজার উজাড় করিয়া গুদামজাত করিলেন। বড় বড় দেশী বিলাতী ব্যবসায়ীরা ভ্রূ তুলিল, মনে মনে হাসিল—কিন্তু অকপট আনন্দে হাত ঘসিতে ঘসিতে মাল সরবরাহ করিল। কেবল নিশিকান্তবাবু কেরাসিন তেলের দিকে গেলেন না; অনেক মূলধন চাই লাখে কুলাইবে না। অপ্রসন্ন চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন,—'করে নিক ব্যাটারা কিছু লাভ।'

দশদিনের দিন নিশিকান্তবাবুর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। তিনি গুদামে গিয়া মাল পরিদর্শন করিলেন, অফিসে বসিয়া খাতাপত্র তদারক করিলেন; তারপর চেয়ারে ঠেসান দিয়া একটি স্থূলাকায় সিগার ধরাইয়া বলিলেন,—'এইবার।'

সেইদিন রাত্রি সাতটার সময় কলিকাতা শহরের সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিবিয়া গেল। রাত্রি দশটার সময় রাস্তার গ্যাস বাতিও হঠাৎ দপদপ করিয়া চক্ষু মুদিল—তিনদিনের মধ্যে আর জ্বলিল না!

*　　　*　　　*

আলোকহীন মহানগরীর বর্ণনা আমরা করিব না। অন্ধকারের যে একটা রূপ আছে—কালিমা লইয়া যাঁহাদের কারবার তাঁহারা সে রূপ নয়ন ভরিয়া দেখুন এবং বর্ণনা করুন। নিশিকান্তবাবুর মত আমরা আলোর কারবারী।

রাস্তা এবং ঘর অন্ধকার; ট্রাম বন্ধ। হ্যারিকেন লণ্ঠন ও মোমবাতির দর ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চড়িতে লাগিল। অথচ ঐ দুইটি দ্রব্য নিশিকান্তবাবুর গুদামে বন্ধ। তিনি অল্পে অল্পে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় রাত্রেও যখন আলো জ্বলিল না, তখন চারিদিকে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য দৈব দুর্ঘটনায় গ্যাস ও ইলেকট্রিক যন্ত্র এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই মেরামত হইতেছে না। কিন্তু গৃহস্থের আলো চাই। লণ্ঠন ও মোমবাতির দাম এমন একটা কোঠায় গিয়া উঠিল যে, কল্পনা করাও কঠিন। নিশিকান্তবাবু মাল ছাড়িতে লাগিলেন, এবং ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। যে সব বড় বড় ব্যবসাদার একগাল হাসিয়া নিশিকান্তকে মাল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারা হাত কামড়াইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মূলধন উঠিয়া বারো হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তাছাড়া এখনো ষাট হাজার টাকার মাল গুদামে মজুত।

বারো হাজার টাকা পকেটে লইয়া নিশিকান্তবাবু অফিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রী তিনটা লণ্ঠন জ্বালিয়া স্বামীর জন্য স্বহস্তে চা তৈয়ার করিতেছিলেন, তাঁহার কোলে নোটের তাড়া ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'এই নাও।'

মাধুরী দেবী এক মুখ হাসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিলেন,—'আজ সরকারকে বাজারে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম; একটা হ্যারিকেনের দাম পাঁচটাকা!—হ্যাঁগা আর ক'দিন?'

* * *

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবুর গুদাম খালি হইয়া গেল।

শেষ কিস্তির ষাট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইবার সময় ছিল না। এই টাকাটাই নিশিকান্তবাবুর মূল লভ্যাংশ। এত টাকা এখন কোথায় রাখিবেন—নিশিকান্ত একটু চিন্তা করিলেন। অফিসের লোহার সিন্দুকে রাখিয়া গেলেও চলে, কিন্তু—দু'একটা সংবাদ নিশিকান্তর স্মরণ হইল। অন্ধকারের সুযোগ লইয়া চোর গুণ্ডার দল খালি অফিস-বাড়ী ইত্যাদি ভাঙিয়া লুট করিতেছে—বড় বড়

দুই তিনটা অফিসে এইরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। নিশিকান্ত নোটের গোছা পকেটে পুরিয়া লইলেন। বাড়ীতে রাখিলে সব চেয়ে নিরাপদ হইবে। বাড়ীতে পাঁচটা গুর্খা দরোয়ান, দশটা চাকর আছে; তাহার উপর আবার দু'জন কনেস্টবলকে খরচা দিয়া পাহারা দিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

নিশিকান্ত অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন মোটরে চড়িলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মোটরের কাচের ভিতর দিয়া দু'ধারি রাস্তার চেহারা সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কলিকাতা যেন রাত্রি যোগে ভৌতিক শহরে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় দোকানের বিদ্যুৎ-দন্ত-বিকশিত হাসি আর নাই, অধিকাংশই বন্ধ। যেগুলি খোলা আছে তাহাতে মোমবাতি ও লণ্ঠন জ্বলিতেছে। পথে গাড়ী মোটরের চলাচলও কম। মানুষ যাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহাদের নিশাচর প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়।

কলেজ ষ্ট্রীট বাজারের নিকটে পৌঁছিয়া নিশিকান্তবাবুর ভারি কৌতূহল হইল। কোনও একটা বড় কাজ করিয়া সাধারণের মতামত জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি মোটর হইতে নামিলেন। একটা ক্ষুদ্র দোকানে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মোমবাতি আছে?'

দোকানদার বলিল,—'আজ্ঞে আছে, তিনটাকা বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত পকেট হইতে তিনটাকা বাহির করিয়া ছদ্ম বিরক্তির কণ্ঠে বলিলেন, 'দিন এক বাণ্ডিল। যত সব চোরের পাল্লায় পড়া গেছে। ইংরাজীতে যাকে বলে 'শার্ক' এই ব্যবসাদার গুলো হচ্ছে তাই।'

দোকানদার নেহাৎ অশিক্ষিত নয়, একটু রসিক; বলিল, 'শার্ক ত পদে আছে মশাই, ব্যবসাদারেরা যাকে বলে তিমি মাছ—তাই! আস্ত গিলে খায়। নিন এক বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত দোকানদারের কথাগুলি চাখিয়া উপভোগ করিলেন ; তিনি নিজেই যে তিমিমাছ, দোকানদার তাহা জানে না— অজ্ঞাতসারেই প্রশংসা করিতেছে! তাঁহার ছদ্ম বিরক্তির ভিতর দিয়া একটু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি মোমবাতির বাণ্ডিল লইয়া মোটরের দিকে ফিরিলেন।

মোটরে উঠিতে যাইবেন, এমন সময়—

তিমিঙ্গিল।

নিশিকান্ত হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চারিপাশে কয়েকজন লোক নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি সচকিতে চারিধারে চাহিলেন ; অস্পষ্ট আলোয় মুখগুলি ভাল দেখা গেল না।

একজন তাঁহার পেটের উপর ছোরার অগ্রভাগ রাখিয়া চাপা গলায় বলিল—'চিল্লাও মৎ!'

আর একজন তাঁহার কোটের ভিতর-পকেটে হাত পুরিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া লইল। নিশিকান্তবাবু হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তিমিঙ্গিলের দল ছায়ার মত অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার মিনিটখানেক পরে নিশিকান্ত উন্মত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'পুলিস! আমার ষাট হাজার টাকা—'

নিশিকান্ত থানায় গেলেন।

থানার দারোগা বলিলেন,—'লিখে নিচ্ছি। কিন্তু টাকা আর পাবেন না। এই আলোর গোলমাল হয়ে অবধি শহরটা চোর বদমায়েসের আড্ডা হয়েছে।'

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে নিশিকান্তবাবুর বিভ্রান্ত চিত্তে একটি ক্ষীণ সান্ত্বনা জাগিতে লাগিল—'যাক তবু বারো হাজার টাকা লাভ রইল।'

রাত্রি আটটার সময় তিনি বাড়ী পৌঁছিলেন। মাধুরী দেবী অধীরভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই

ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, ‘ওগো ভারি সুখবর! নীলকান্ত প্রেস কিনে নিয়েছি। বারো হাজারেই রাজি হয়ে গেল।’

নিশিকান্ত বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার গলা দিয়া একপ্রকার ঘড় ঘড় শব্দ বাহির হইল। ঘরের মধ্যেও যে তিমিঙ্গিল বসিয়া আছে তাহা কে জানিত!

এই সময়, যেন নিশিকান্তকে বিদ্রূপ করিয়া, কলিকাতার ইলেকট্রিক বাতি আবার জ্বলিয়া উঠিল। বাঞ্চাল যন্ত্র এতদিনে ঠিক হইয়া গিয়াছে!

প্রতিদ্বন্দ্বী

নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাশ্বত। কিন্তু বহুলাংশে উহা ফল্গু নদীর মত অন্তঃপ্রবাহিনী বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সাধারণত নরনারীর মধ্যে প্রেমটাই চোখে পড়ে।

বিবাহ নামক সংস্কারটা উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পূর্ণ বিকাশ। তাই কাব্য ও রোমান্সে দুইটি নরনারীকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া লেখক লেখনী সম্বরণ করেন। অর্থাৎ, দুইটি যুদ্ধোদ্যত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আখড়ায় ঢুকাইয়া দিয়া সরিয়া পড়েন। অতঃপর যে কেলেঙ্কারী আরম্ভ হইবে, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিবার সাহস তাঁহার নাই।

নৃসিংহ বাবুর অন্তরে কাব্য বা রোমান্সের বাষ্পটুকু ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তিনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দম সাহস ছিল এবং লোকে বলিত, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি না কি Natural Selection নামক জৈব আইনকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার মৎলব করিয়াছিলেন। অসম্ভব নয়; আমরা যতদূর জানি, লোকটি অতিশয় ধূর্ত্ত ও ফন্দিবাজ।

কোন বৈজ্ঞানিক দুরভিসন্ধিবশত নৃসিংহ বাবু এক ঝাঁক পায়রা ও একপাল খরগোস পুষিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার এক শ্যালীর পুত্র ও ভগিনীর কন্যাও তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইত। ইহারা সকলেই অনাথ; নৃসিংহ বাবু ছাড়া ইহাদের আর কেহ ছিল না।

নৃসিংহ বাবুরও ইহারা ছাড়া আর কেহ ছিল না। স্ত্রী বহুকাল পূর্ব্বে Survival of the Fittest নামক আইন শিরোধার্য্য করিয়া

বিগত হইয়াছিলেন। সন্তানাদিও কস্মিন কালে হয় নাই। সুতরাং তাঁহার সংসারে পারাবত, শশক, শ্যালীর পুত্র ও ভাগিনেয়ী ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। নৃসিংহ বাবু ছিলেন ইহাদের ভাগ্য-বিধাতা।

নৃসিংহ বাবুর বয়স ছাপ্পান্ন। তাঁহার মস্তকের মধ্যস্থলে একটিমাত্র কেশ ছিল; প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি সেটিকে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইতেন, তারপর বুরুশ দিয়া মস্তকের উপর শোয়াইয়া দিতেন। অতঃপর এক বাটি দুগ্ধ পান করিয়া তিনি ল্যাবরেটারিতে প্রবেশ করিতেন। বাড়ীতে থাকিয়া যাইত নীরেন ও মিলু। নৃসিংহ বাবু অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ঝগড়া আরম্ভ করিত।

ঝগড়ার কোন হেতু ছিল না, নিতান্ত অকারণেই পরস্পরের ছুতা ধরিয়া ইহারা ঝগড়া করিত। নীরেন মিলু অপেক্ষা ছয় সাত বৎসরের বড়, কিন্তু সেজন্য তাহাদের বাধিত না। বছর আষ্টেক আগে যখন এই বাড়ীতে তাহাদের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়, তখনই এই কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল। নবাগত নীরেন মিলুকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিল, 'এই ছুঁড়ি, তুই বুঝি এই বাড়ীর ঝি? আমার জুতো ভাল করে বুরুশ করে রেখে দে ত।'

দশম বর্ষীয়া মিলু কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল,—

'মামা একটা বাঁদর পুষবেন বলেছিলেন; তুমি বুঝি সেই বাঁদরটা!'

আড়াল হইতে নৃসিংহ বাবু এই কথোপকথন শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহার মনে একটা কুটিল অভিসন্ধি জাগিয়াছিল।

অতঃপর নীরেন ও মিলু একত্র বড় হইয়াছে; দু'জনেই এখন কলেজে পড়ে। কিন্তু তাহাদের বিরোধ কিছুমাত্র কমে নাই। চোখাচোখি হইলেই তাহারা ঝগড়া করে; এমন কি বেশীক্ষণ চোখাচোখি না হইলে দু'জনেরই মন ছটফট করিতে থাকে। তখন

একজন আর একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাড়ম্বরে কলহ আরম্ভ করিয়া দেয়।

তাহাদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বাড়ীর ঝি অন্নদা ছড়া কাটিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল—

"মরি কি ভাবের হুলোহুলি
না দেখলে প্রাণে মরি, দেখলে চুলোচুলি।"

নৃসিংহ বাবু অবশ্য বিজ্ঞানে মগ্ন আছেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি এসব কিছু লক্ষ্য করেন। পায়রা ও খরগোসের মত ইহারা দুজনেও যেন তাঁহার জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নীরেন ও মিলুর কলহের ক্রমবিকাশ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। প্রথম কিছুদিন তাহারা নির্লজ্জভাবে মারামারি করিয়াছিল। একবার নীরেন মিলুর উরুতে ছুরির এক কোপ বসাইয়া দিয়াছিল; পরিবর্ত্তে মিলু নীরেনের হাত কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া দেয়; দুজনের দেহেই সে ক্ষত চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যতই তাহাদের বয়স বাড়িতে লাগিল, যুদ্ধের রীতিতেও ক্রমশ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এখন আর কেহ কাহাকেও দৈহিক আক্রমণ করে না, যুদ্ধের অস্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। মনের-প্রগতির ইহাই ইতিহাস।

সেদিন সকালে নৃসিংহ বাবু তাঁহার একটি মাত্র কেশ যথারীতি প্রসাধন পূর্ব্বক ল্যাবরেটারিতে প্রস্থান করিবার পর, মিলু নীরেনের ঘরে গিয়া দেখিল, নীরেন তখনও ঘুমাইতেছে। মিলু কিয়ৎকাল চিন্তিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা খরগোস আনিয়া তাহার বিছানায় ছাড়িয়া দিবে? না, সেটা নূতন কিছু হইবে না কারণ কিছু দিন পূর্ব্বে নীরেনই ঐ কার্য্যটি করিয়াছিল। তাহার অনুকরণ করিলে নীরেন খুশীই হইবে।

সহসা মাথায় কোন বুদ্ধি গজাইল না। তখন মিলু নীরেনের নাকে একটি খড়্কে কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল,—'কুম্ভকর্ণ, ওঠ—আটটা বেজে গেছে'—বলিয়া প্রস্থান করিল।

নীরেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল,—'রাক্ষুসী—' বলিয়াই প্রচণ্ড বেগে হাঁচিয়া ফেলিল।

মুখ-হাত ধুইয়া সে টেবিলের সম্মুখে বসিল এবং গভীর মনঃসংযোগে কি লিখিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক মিনিট পরে মিলু আসিয়া জলখাবারের রেকাবি টেবিলের উপর রাখিতেই নীরেন অসম্পূর্ণ লেখাটা লুকাইয়া ফেলিল। মিলু কিন্তু এক নজর লেখাটা দেখিয়া লইয়াছিল, বলিল,—'কি লেখা হচ্ছিল? পদ্য? আ মরে যাই! কার নামে পদ্য লেখা হচ্ছে?'

নীরেন বলিল, 'যার নামেই লিখি না—'

মিলু ফস্ করিয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া পড়িল—

'একটি বালিকা—নামটি তার মিলু
মস্তকে তার নাই এক ফোঁটা ঘিলু—'

নীরেনের নাকে কাঠি দিয়া মিলু যে বিজয়গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল তাহা লুপ্ত হইয়া গেল, সে দু'হাতে কাগজখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ক্রোধ অবরুদ্ধ স্বরে বলিল,—'আচ্ছা আমিও জানি। মাথায় ঘিলু আছে কি না দেখিয়ে দেব।'

তখনকার মত বিজয়ী নীরেন দন্ত বাহির করিয়া হাসিল এবং পরম পরিতৃপ্তি সহকারে জলযোগ আরম্ভ করিল।

দু'জনেই যথাসময়ে কলেজে গেল; নীরেন যাইবার সময় মিলুর দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল। মিলু নিদ্রালু বিড়ালীর মত কেবল চক্ষু কুঞ্চিত করিল।

নীরেন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল তাহার টেবিলের উপর একটি ছয় পংক্তির কবিতা শোভা পাইতেছে।

একটি যুবক নামটি তাহার নীরু,
ক্যাবলার রাজা, চাষা, অসভ্য ভীরু,
মহিলাগণের সম্মান নাহি জানে ;
বুদ্ধি এবং শিক্ষার দোষ—মানে—
মানুষ না হয়ে ভাল্লুক হত যদি
নাচ দেখিতাম আনন্দে নিরবধি।

নীরেন কবিতা পাঠ শেষ করিয়াছে, এমন সময় মিলু প্রবেশ করিয়া বলিল,—'কেমন কবিতা ?'

নীরেন দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল,—'আমার ছন্দ চুরি করেছিস।'

মিলু বিদ্রূপপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—'ইঃ—ওঁর ছন্দ ! বাজার থেকে উনি কিনে এনেছেন !'

নীরেন উত্তপ্ত স্বরে বলিল,—'তুই একটা চোর।'

মিলু ততোধিক উত্তপ্ত স্বরে বলিল,—'তুমি একটি ডাকাত।'

নীরেন চেয়ারে বসিয়া বলিল,—'তুই প্যাঁচা।'

মিলু তাহার সম্মুখে আর একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল,—'তুমি হাঁড়িচাঁচা।'

দুজনেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিল।

—'তুই ইঁদুর।'

—'তুমি টিকটিকি।'

—'তুই ক্যাঙারু।'

—'তুমি গণ্ডার।'

এই ভাবে কিছুক্ষণ চলিল। ক্রমে পশুপক্ষীর নাম ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন মিলু জিভ বাহির করিয়া নীরেনকে ভ্যাংচাইয়া দিল। নীরেন প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তার পর সেও দীর্ঘ

জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। বিরোধ এতটা চরমে অনেক দিন উঠে নাই।

এই সময় নৃসিংহ বাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মিলু ও নীরেন চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধ এবং জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত করিয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে! তিনি ধূর্ত্ত বৈজ্ঞানিক, চট করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। আনন্দে তাঁহার মস্তকের একটি মাত্র কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

তিনি হর্ষোৎফুল্লস্বরে ডাকিলেন, 'মিলু, নীরেন!'

উভয়ে জিহ্বা সম্বরণ করিয়া চক্ষু মেলিল।

নৃসিংহ বাবু বলিলেন, 'বড় খুশী হয়েছি। তোমরাই আমার থিয়োরী প্রমাণ করতে পারবে। আমি তোমাদের দুজনের বিয়ে দেব—পরস্পরের সঙ্গে। হাঃ হাঃ হাঃ।'—তিনি প্রস্থান করিলেন।

মিলু ও নীরেন পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তাবটা আকস্মিক বটে, কিন্তু সেজন্য কেহ বিস্মিত হইল না। নৃসিংহ বাবুর সকল কার্য্যই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অমান্য করিবার কল্পনাও কখনো ইহাদের মাথায় আসে নাই। তিনি ইচ্ছামত পায়রা ও খরগোসের বিবাহ দিতেন, কেহ আপত্তি করে নাই, এক্ষেত্রেও কেহ আপত্তি করিল না। বরং সারাজীবন ধরিয়া দুজনে দুজনকে জ্বালাতন করিতে পারিবে এই আনন্দেই আত্মহারা হইয়া পড়িল। উভয়েই একই সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'এবার মজা টের পাবে।'

ফুলশয্যার রাত্রে নীরেন খাটে বসিয়া পা দুলাইতেছিল, মিলু প্রবেশ করিতেই গম্ভীর স্বরে বলিল, 'আমি হচ্ছি তোমার স্বামী, শীগগির প্রণাম কর।'—বলিয়া নিজের পায়ের দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিল।

মিলু তৎক্ষণাৎ ভাল মানুষের মত গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল; তারপর উঠিবার সময় নীরেনের পায়ে চিমটি কাটিয়া দিল।

নারেন লাফাইয়া উঠিল,—'উঃ!' তারপর দুই বাহুর দ্বারা পলায়নপরা মিলুকে চাপিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, 'তবে রে—'

দুজনের দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়া গেল।

আশা করিতেছি ইহাদের দাম্পত্যজীবন অন্যান্য সাধারণ দাম্পত্য জীবন হইতে পৃথক হইবে না। কারণ নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন যাহাই হোক—সার্ব্বজনীন; মিলু ও নীরেন সাধারণ পাঁচ জনের মতই ঝগড়া করিয়া, ভালবাসিয়া, পরস্পরকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়া জৈব ধর্ম্ম পালন করিবে।

আমরা অবশ্য বিবাহ দিয়াই সরিয়া পড়িলাম।

অশরীরী

পুরাতন উই-ধরা ডায়েরিখানি সাবধানে খুলিয়া বরদা বলিল—'অদ্ভুত জিনিস, কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। আমাদের আবদুল্লা কুঁজড়াকে জান ত? সাহেবদের কুঠি থেকে পুরাণো বই সের দরে কিনে বিক্রি করতে আসে? তারি কাছ থেকে এটা কিনেছি, ঝাঁকায় ক'রে এক গাদা বই নিয়ে এসেছিল, বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি একটা বাংলায় লেখা ডায়েরি। নগদ দু-পয়সা খরচ ক'রে তৎক্ষণাৎ কিনে ফেললুম।'

অমূল্য দৈবক্রমে আজ ক্লাবে আসে নাই, তাই বাকবিতণ্ডায় বেশী সময় নষ্ট হইল না। বরদা বলিল—'পড়ি শোনো। বেশী নয়, শেষের কয়েকটা পাতা খালি পড়ে শোনাব। আর যা আছে তা না শুনলেও কোন ক্ষতি নেই। এ ডায়েরির লেখক কে তা ডায়েরি পড়ে জানা যায় না। তবে তিনি যে কলকাতা হাইকোর্টের একজন য়্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।'

ল্যাম্পটা উস্কাইয়া দিয়া বরদা পড়িতে আরম্ভ করিল,—৭ ফেব্রুয়ারি—আজ মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে পীর-পাহাড় প্রায় মাইল-তিনেক দূরে—শহরের বাহিরে। মুঙ্গের শহরের যতটুকু দেখিলাম, কেবল ধূলা আর পুরাতন সেকেলে বাড়ি। যা হোক, আমাকে শহরের মধ্যে থাকিতে হইবে না ইহাই রক্ষা। ষ্টেশন হইতে আসিতে পথে কেল্লার ভিতর দিয়া আসিলাম। কেল্লাটা মন্দ নয়। পুরাতন মীরকাশিমের আমলের কেল্লা,—গড়খাই দিয়া ঘেরা। প্রাকারের ইটপাথর অনেকস্থানে খসিয়া গিয়াছে।

বড় বড় গাছ উচ্চ প্রাচীরের উপর জন্মিয়া শুষ্ক গড়খাইয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদিন এই গড়ের প্রাচীরে সতর্ক সান্ত্রী পাহারা দিত, প্রহরে প্রহরে দুর্গদ্বারে নাকাড়া বাজিত, সন্ধ্যার সময় লোহার তোরণ-দ্বার ঝনৎকার করিয়া বন্ধ হইয়া যাইত,—কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না।

পীর-পাহাড়ের বাড়িখানি চমৎকার। এমন বাড়ি যাহার, সে চিরদিন এখানে থাকে না কেন এই আশ্চর্য। যা হোক, পাহাড়ের উপর নির্জন প্রকাণ্ড বাড়ীখানিতে একাকী একমাস থাকিতে পারিব জানিয়া ভারি আনন্দ হইতেছে। বন্ধু কলিকাতায় থাকুন, আমি এই অবসরে তাঁহার বাড়িটি ভোগ করিয়া লই।

কলিকাতা হাইকোর্টে প্রায় দেড়মাস ধরিয়া প্রকাণ্ড দায়রা মোকদ্দমা চালাইবার পর সত্য সত্যই বিশ্রাম করিতে হইলে এমন শান্তিপূর্ণ স্থান আর নাই। আমার শরীর যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ শুধু অত্যধিক পরিশ্রম নয়—মানুষের সহিত অবিশ্রাম সংঘর্ষ। যে-লোক মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে তাহার পেট হইতে সত্য কথা টানিয়া বাহির করা এবং যে-হাকিম বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে কিরূপ বুকভাঙা ব্যাপার তাহা যিনি এ পেশায় ঢুকিয়াছেন তিনিই জানেন। মানুষ দেখিলে এখন ভয় হয়, কেহ কথা কহিবার উপক্রম করিলেই পলাইতে ইচ্ছা করে। তাই একেবারে নিঃসঙ্গ ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, বামুন-চাকর পর্যন্ত সঙ্গে লই নাই। ইক্‌মিক্ কুকার সঙ্গে আছে, তাহাতেই নিজে রাঁধিয়া খাইব।

কি সুন্দর স্থান! পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর বাড়িটি, চারিদিকের সমতলভূমি হইতে প্রায় তিন-চার শ' ফুট উচ্চে। ছাদের উপর দাঁড়াইলে দেখা যায়, একদিকে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার চর। তাহার উপর এখন সরিষা জন্মিয়াছে—সবুজ জমির উপর হলুদ

বর্ণ ফুলের স্ফুলিঙ্গ। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অগণ্য অসংখ্য তালগাছের মাথা জাগিয়া আছে, আরও কত প্রকারের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল ; তাহার ভিতর দিয়া গেরিমাটি-ঢাকা পথটি বহু নিম্নে গোলাপী ফিতার মত পড়িয়া আছে। এ যেন কোন্ স্বর্গলোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ীতে একটা মালী ছাড়া আর কেহ নাই, সে-ই বাড়ীর তত্ত্বাবধান করে এবং দু-চারটা মৃতপ্রায় গোলাপ গাছে জল দেয়। জল পাহাড়ের উপর পাওয়া যায় না, পাহাড়ের পাদমূলে রাস্তার ধারে একটি কূয়া আছে সেখান হইতে আনিতে হয়। মালীটার সহিত কথা হইয়াছে আমার জন্য দু-ঘড়া জল রোজ আনিয়া দিবে, তাহাতেই আমার স্নান ও পান দুই কাজই চলিয়া যাইবে।

মালীটাকে বলিয়া দিয়াছি, পারতপক্ষে যেন আমার সম্মুখে না আসে। আমি একলা থাকিতে চাই।

৮ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এত ঘুমাইয়াছি যে, জীবনে বোধ হয় এমন ঘুমাই নাই। রাত্রি নয়টার সময় শুইতে গিয়াছিলাম, যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা সাতটা—ভোরের রৌদ্র খোলা জানালা দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গোছগাছ করিয়া সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছি। সঙ্গে কিছু চাল ডাল আলু ইত্যাদি আনিয়াছিলাম, তাহাতে আরও তিন-চার দিন চলিবে। ফুরাইয়া গেলে মালীকে দিয়া শহরের বাজার হইতে আনাইয়া লইব। ট্রাঙ্কগুলা খুলিয়া দেখিলাম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই আছে। দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম সাবান তেল আয়না চিরুণী কিছুই ভুল হয় নাই। এক বাণ্ডিল ধূপের কাঠিও রহিয়াছে দেখিলাম, ভালই হইল। এখনও অবশ্য একটু শীত আছে, কিন্তু গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে মশার উপদ্রব বাড়িতে পারে। চাকরটার বুদ্ধি আছে দেখিতেছি, কতকগুলা বই ও কাগজ পেনসিল ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া

দিয়াছে। যদিও এই একমাসের মধ্যে বই স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তবু হাতের কাছে দু' একখানা থাকা ভাল।

বইগুলা কিন্তু একেবারেই বাজে। পরলোক ভূতদর্শন, উন্মাদ ও প্রতিভা—এ-সব বই আমি পড়ি না। চাকরটা বোধ হয় ভাবিয়াছে আইন ছাড়া অন্য যে-কোনো বই পড়িলেই আমি ভাল থাকিব। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে—সাধে কি বলে, স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

এখানেও একটা ছোটখাট লাইব্রেরী আছে দেখিতেছি। একটা ক্ষুদ্র আলমারীতে গোটাকয়েক পুরাতন উপন্যাস, অধিকাংশই সম্মুখের ও পশ্চাতের পাতা ছেঁড়া। যা হোক পড়িবার যদি ইচ্ছা হয়—বইয়ের অভাব হইবে না।

দুপুর বেলাটা ভারি আনন্দে কাটিল। শূন্য বাড়িময় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পাহাড়ের উপর এই বৃহৎ বাড়ি কে তৈয়ার করিয়াছিল—ইহার কোনো ইতিহাস আছে কি? কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বাড়ি যে-ই তৈয়ার করুক তাহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়। যে-পাহাড়ের উপর বাড়ীটি প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে একটি উল্টানো বাটির মত,—কবি হইলে আরও রসাল উপমা দিতে পারিতাম,—হয়ত সাদৃশ্যটাও আরও বেশী হইত,—কিন্তু আমার পক্ষে উল্টানো বাটিই যথেষ্ট। শাদা বাড়ীখানা তাহার উপর মাথা তুলিয়া আছে। বাড়িখানা যেমন বৃহৎ তেমনি মজ্‌বুত—মোটা মোটা দেওয়ালের মাঝখানে বিশাল এক একটা ঘর, নিজের বিশালতার গৌরবে শূন্য আসবাবহীন অবস্থাতেও সর্বদা গম্‌গম্‌ করিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা সমতল স্থান আছে, তাহাতে গোলাপ বাগান। গোলাপ বাগানের শেষে ফটক, ফটকের বাইরেই নীচে যাইবার ঢালু পাথর-ভাঙা পথ বাঁকিয়া বাড়ির কোল দিয়া নামিয়া গিয়াছে। ফটকের

সম্মুখে কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড কূপ, গভীর হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার তল পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। কূপের চারিপাশে আগাছা জন্মিয়াছে, একটা শিমুলগাছ তাহার মুখের বিরাট গর্তটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কূপের ভিতর এক খণ্ড পাথর ফেলিয়া দেখিলাম, অনেকক্ষণ পরে একটা ফাঁপা আওয়াজ আসিল। কূপটা নিশ্চয় শুষ্ক।

সন্ধ্যার সময় কূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। নীচে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দূরে দূরে দু-একটা প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপরে এখনও বেশ আলো আছে। পশ্চিম দিকটা গৈরিক ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতে ভারি চমৎকার। এই বাড়িতে আমার দুই দিন কাটিল।

হঠাৎ কাঁধের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করিয়া দেখি, এক ঝলক রক্ত সেখানে পড়িয়াছে। কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিলাম, রক্ত নয়—ফুল। শিমুল গাছটায় দু-চারটা ফুল ধরিয়াছিল, ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

ফুলটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফুল দিয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারী। আজ শরীরটা ভাল ঠেকিতেছে না; বোধ হয় একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা উত্তাপ অনুভব করিতেছি। মোকদ্দমা লইয়া যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার কুফল এখনও শরীরে লাগিয়া আছে; অকারণে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া উঠে। আজ উপবাস করিয়াছি, আশা করি কাল শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া যাইবে।

১০ ফেব্রুয়ারী। প্রাচীন গ্রীসে সংস্কার ছিল, প্রত্যেক গাছ লতা নদী পাহাড়ের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞান শাসিত যুগে কথাটা হাস্যকর হইলেও উপদেবতা

অধিষ্ঠিত গাছপালার কথা কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না। সাঁওতালদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কার আছে শুনিয়াছি। যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে তাহাদের মধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস হয়ত স্বাভাবিক। মানুষ যেখানেই থাকুক, দেবতা সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা সভ্য হইয়া ইট-পাথরের মন্দিরের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহারা বনের মানুষ তাহারা গাছপালা নদী-নালাতেই দেবতার আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আত্মবিশ্বাসের যেখানে অভাব সেইখানেই দেবতার জন্ম। মানুষ সহজ অবস্থায় ভূত প্রেত উপদেবতা, এমন কি দেবতা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না; ও-সব বিশ্বাস করিতে হইলে রীতিমত মস্তিষ্কের ব্যাধি থাকা চাই। কিন্তু সে যাহাই হোক, উপদেবতার কথা কল্পনা করিতে বেশ লাগে। আমার ঐ শিমুল গাছটার যদি একটা দেবতা থাকিত তাহাকে দেখিতে কেমন হইত? কিংবা অতদূর যাইবার প্রয়োজন কি, এই পাহাড়টারও ত একটা দেবতা থাকা উচিত—তিনিই বা কিরূপ দেখিতে শুনিতে? তিনি যদি হঠাৎ একদিন আমাকে দেখা দেন তবে কেমন হয়?

১১ ফেব্রুয়ারী। দিনের বেলাটা পাহাড়ের উপরেই এধার-ওধার ঘুরিয়া এবং রান্নাবান্নার কাজে বেশ একরকম কাটিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত এই তিন-চার ঘণ্টা সময় যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। এখন কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে, সূর্যাস্তের পরই চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া যায়। তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া যায়, কেবল আকাশের তারাগুলা যেন অত্যন্ত নিকটে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি ইক্‌মিক কুকারে রান্না চড়াইয়া দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া থাকি। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না—আনাচে-কানাচে অন্ধকার থাকিয়া যায়।

প্রকাণ্ড বাড়ীতে আমি একা।

১২ ফেব্রুয়ারী। মনটা অকারণে বড় অস্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে যেন কাহার অদৃশ্য চক্ষু আমাকে অনুসরণ করিতেছে, বার-বার ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে দেখিতেছি। অথচ বাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। স্নায়বিক উত্তেজনা—তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড় অস্থির বোধ হইতেছে,—নার্ভের কোনো ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত।

১৩ ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমার স্নায়ুগুলা এখনও ধাতস্থ হয় নাই—কিংবা—

না, না, ও সব আমি বিশ্বাস করি না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার সর্বাঙ্গে অতি লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া দিতেছে! কি অপূর্ব রোমাঞ্চকর সে স্পর্শ তাহা বলিতে পারি না। মুখের উপর হইতে আঙুল চালাইয়া পায়ের পাতা পর্যন্ত লইয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘর অন্ধকার ছিল; এই শারীরিক সুখস্পর্শের মোহে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিয়া, ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল কে যেন নিঃশব্দে শয্যার পাশ হইতে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে ঘুমের আবেশ একেবারে ছুটিয়া গিয়াছিল, ভাবিলাম—চোর নয় ত? কিন্তু চোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে কেন? তা ছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছি। আমি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—কে? কোনো সাড়া নাই। গা ছমছম্ করিতে লাগিল। বালিশের পাশে দেশলাই ছিল, আলো জ্বালিলাম। ঘরে কেহ নাই, দরজা পূর্ববৎ বন্ধ। ভাবিলাম, ঘুমাইয়া নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিয়াছি। এমন অনেক সময় হয়, ঘুম ভাঙিয়াছে মনে হইলেও ঘুম সত্যই ভাঙে না—নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে মনটা অর্ধচেতন অবস্থায় থাকে।

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম, খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিলাম এক আকাশ নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। ঘরের বদ্ধ বায়ু হইতে বাহিরে আসিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বাড়ীর চারিদিকে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারী করিবার পর একটু গা শীত শীত করিতে লাগিল, আবার ঘরে ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইলাম। আলোটা নিবাইলাম না, কমাইয়া দিয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলাম।

এটা কি সত্যই স্বপ্ন ?—রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না।

১৪ ফেব্রুয়ারী। কাল আর কোন স্বপ্ন দেখি নাই। আধ-আশা আধ-আশঙ্কা লইয়া শুইতে গিয়াছিলাম—হয়ত আজ আবার স্বপ্ন দেখিব ; কিন্তু কিছুই দেখি নাই। আজ শরীর বেশ ভাল বোধ হইতেছে।

চাল ডাল কেরোসিন তৈল ইত্যাদি ফুরাইয়া গিয়াছিল, মালীকে দিয়া বাজার হইতে আনাইয়া লইয়াছি। মালীটা জাতে গোয়ালা হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক, সেই যে, তাহাকে আমার সম্মুখে আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম তারপর হইতে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার কাছে আসে না। কখন জল দিয়া যায় আমি জানিতেও পারি না। আমিও আসিয়া অবধি পাহাড় হইতে নীচে নামি নাই, সুতরাং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এ-কয়দিন হয় নাই বলিলেই চলে। নীচে রাস্তা দিয়া মানুষ চলাচল করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এতদূর হইতে তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই।

আজ বাড়ীতে চিঠি দিয়াছি, লিখিয়াছি বেশ ভাল আছি। কিন্তু তাহাদের চিঠিপত্র দিতে বারণ করিয়া দিয়াছি। আমার এই বিজন বাসের মাধুর্য চিঠিপত্রের দ্বারাও খণ্ডিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়।

বাহিরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটিতেছে-না-ঘটিতেছে তাহার খোঁজ রাখিতে চাই না।

১৫ ফেব্রুয়ারী। আজ আবার মনটা অস্থির হইয়াছে। কি যেন হইয়াছে, অথচ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরীর ত বেশ ভালই আছে। তবে এমন হইতেছে কেন?

কাল ভাবিতেছি একবার শহরটা দেখিয়া আসিব। শুনিয়াছি নবাবী আমলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

কাছেই কোথায় নাকি সীতাকুণ্ড নামে গরম জলের একটা প্রস্রবণ আছে, বন্ধু বলিয়া দিয়াছিলেন সেটা দেখা চাই। অতএব সেটাও দেখিতে হইবে।

১৬ ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে আবার সেইরূপ ঘটিয়াছে। স্বপ্ন নয়—এ স্বপ্ন নয়! স্পষ্ট অনুভব করিলাম, কে আমার পাশে বসিয়া অতি কোমল হস্তে ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ বক্ষে শুইয়া রহিলাম। বালিশের তলায় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম, সুতরাং এ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা হইতেই পারে না।

অদৃশ্য হাতটা কতবার আমার আপাদমস্তক বুলাইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। একবার হাতখানা যখন আমার বুকের কাছে আসিয়াছে তখন হাত বাড়াইয়া আমি সেটা ধরিতে গেলাম। মনে হইল আমার মুঠির মধ্যে হাতটা গলিয়া মিলাইয়া গেল। হাত-বুলানোও বন্ধ হইল। অনুভবে বুঝিলাম, সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, এখনও যায় নাই। আমি চোখ চাহিয়া শুইয়া রহিলাম—সেও দাঁড়াইয়া রহিল। ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—চোখ খুলিয়া থাকা বা বুজিয়া থাকার কোন প্রভেদ নাই। উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম কোনো শব্দ হয় কি-না। দরজায় কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে—তাহারই শব্দ শুনিতেছি। আর কোনো শব্দ নাই।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা বুঝিলাম, সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল ; আজ আর আসিবে না। ঘুমাইয়া পড়িলে হয়ত থাকিত। আমি যখনই ঘুমাই, তখনই কি সে আমার সুপ্ত শরীরের উপর পাহারা দেয় ?

কিন্তু আশ্চর্ব ! আজ আমার একটুও ভয় করিল না কেন ?

১৭ ফেব্রুয়ারী। আমার শিমুল গাছ রক্তরাঙা ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছে পাতা নাই, কেবলই ফুল।

সেদিন যে আমার কাঁধের উপর এক ঝলক রক্তের মত ফুল পড়িয়াছিল—সে কি স্বাভাবিক ? এত স্থান থাকিতে আমার কাঁধের উপরই বা পড়িল কেন ? তবে কি কোনো অদৃশ্য হস্ত গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আমার গায়ে ফেলিয়াছিল ? কে সে ? বৃক্ষ দেবতা ? না, আমারই মত মানুষের দেহ বিমুক্ত আত্মা ? তাই কি ? একটা দেহহীন আত্মা ! সে আমাকে পাইয়া খুশী হইয়াছে তাহাই কি আকারে ইঙ্গিতে জানাইতে চায় ? সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায় তাই কি সে-দিন ফুল দিয়া আমার সম্বর্ধনা করিয়াছিল।

তবে কি সত্যই প্রেতযোনি আছে ? দেহমুক্ত অশরীরী আত্মা ? বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু there are more things in heaven and earth—

একটা বিষয়ে ভারি আশ্চর্য লাগিতেছে,—ভয় করে না কেন ? এই নির্জন স্থানে একলা আছি, এ অবস্থায় ভয় হওয়াই ত স্বাভাবিক !

১৮ ফেব্রুয়ারী। আনমনে দিন কাটিয়া গেল। শূন্য বাড়িময় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পছিয়াঁ হাওয়া দিতেছে—খুব ধূলা উড়িতেছে। গঙ্গার চরের দিকটা বালুতে অন্ধকার কিছু দেখা যায় না।

আজ কিছু ঘটে নাই। মনটা উদাস বোধ হইতেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারী। দিনটা যেন রাত্রির প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কিছু অনুভব করি না কেন?

সন্ধ্যার সময় দেখিলাম পশ্চিম আকাশে সরু একটি চাঁদ দেখা দিয়াছে—যেন অসীম শূন্যে অপার্থিব একটু হাসি! অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ অস্ত গেল, তখন আবার নীরন্ধ্র অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিয়া লইল।

ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না চড়াইয়া অন্যমনে বসিয়া ছিলাম। আলোটা সম্মুখের ভাঙা টেবিলে বসানো ছিল। অদূরে কতকগুলা ধূপ জ্বালিয়া দিয়াছিলাম, তাহারই সুগন্ধ ধূমে ঘরটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আর ত যা-হোক একটা কিছু না পড়িয়া থাকা যায় না। বসিয়া বসিয়া সহসা কি মনে হইল, বাক্স হইতে সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

গল্প—নেহাৎ গল্প! সত্য অনুভূতির ছায়া মাত্র এ সব কাহিনীতে নাই। আমি যেমন করিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছি, চোখে না দেখিয়াও সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার সামীপ্য উপলব্ধি করিয়াছি—সেরূপ ভাবে আর কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?

ইহারা লিখিতেছে, চোখে দেখিয়াছে। চোখে দেখা কি যায়? যে আমার কাছে আসে সে কেমন দেখিতে? আমারই মত কি তার হস্ত পদ অবয়ব আছে? মানুষের চেহারা, না অন্য কিছু!

বই হইতে চোখ তুলিয়া ভাবিতেছি এমন সময় আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল ঘটিল। ধূপের কাঠিগুলি হইতে যে ক্ষীণ ধূমরেখা উঠিতেছিল তাহা শূন্যে কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে যেন একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। অদৃশ্য কাচের শিশিতে রঙীন জল ঢালিলে যেমন তাহা শিশির আকারটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আমার মনে হইল ঐ ধোঁয়া যেন কোরো অদৃশ্য আধারে

প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তদাকারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ধূসর রঙের একটি বস্ত্রের আভাস দেখা দিল। বস্ত্রের ভিতর মানুষের দেহ ঢাকা রহিয়াছে, বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে তাহার পরিচয় পাইতে লাগিলাম।...ধূম কুণ্ডলী মূর্তি গড়িয়া চলিল; আবছায়া মূর্তির ভিতর দিয়া ওপারের দেয়াল দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তবু তাহার ডৌল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একটা মানুষের চেহারা। ধূম পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমে মূর্তির গলা পর্যন্ত পৌঁছিল। এইবার তাহার মুখ দেখিতে পাইব।...কি রকম সে মুখ? বিকট? ভয়ানক? কিন্তু ঠিক এই সময় সহসা সব ছত্রাকার হইয়া গেল। জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঐ ধূমমূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। মুখ দেখা হইল না।

প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম যদি আবার দেখিতে পাই। কিন্তু আর সে মূর্তি গড়িয়া উঠিল না।

২০ ফেব্রুয়ারী। সে আছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। দিনের বেলা সে কোথায় থাকে জানি না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি তাহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাই কি মিথ্যা! বাতাস দেখিতে পাই না, বাতাস কি মিথ্যা? শুনিয়াছি একপ্রকার গ্যাস আছে যাহা গন্ধহীন ও অদৃশ্য, অথচ তাহা আঘ্রাণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। সে গ্যাস কি মিথ্যা?

না, সে আছে। আমার মন জানিয়াছে সে আছে।

২১ ফেব্রুয়ারী। কে সে? তাহার স্পর্শ আমি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না কেন? ছুঁইতে গেলেই সে মিলাইয়া যায় কেন? সে দেখা দিতে চেষ্টা করে জানি, কিন্তু দেখা

দিতে পারে না কেন? রক্তমাংসের চক্ষু দিয়া কি ইহাদের দেখা যায় না?

আমি এখন শয়নের পূর্বে ডায়েরী লিখিতেছি, আর সে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার লেখা পড়িতেছে। আমি জানি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইলে তাহাকে দেখিতে পাইব না—সে মিলাইয়া যাইবে।

কেন এমন হয়? তাহাকে কি দেখিতে পাইব না? দেখিবার কি দুর্দম আগ্রহ যে প্রাণে জাগিয়াছে তাহা কি বলিব। তাহার এই দেহহীন অদৃশ্যতাকে যদি কোন রকমে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতাম! কোন কি উপায় নাই?

২২ ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে সে আসে নাই। সমস্ত রাত্রি তার প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু তবু সে আসিল না। কেন আসিল না? তবে কি আর আসিবে না?

নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। আমার প্রতি রজনীর সহচর সহসা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর যদি না আসে?

২৩ ফেব্রুয়ারী। জানিয়াছি—জানিয়াছি! সে নারী!

এ কি অভাবনীয় ব্যাপার, যেন ধারণা করিতে পারিতেছি না। আজ সকালে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া দেখি, একগাছি দীর্ঘ কাল চুল আমার চিরুণীতে জড়ানো রহিয়াছে। এ চুল আমার চিরুণীতে কোথা হইতে আসিল! বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি এ তাহার চুল। সে নারী! সে নারী!

কখন তুমি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়া এই অভিজ্ঞানখানি রাখিয়া গিয়াছ? কি সুন্দর তোমার চুল! তুমি আমায় ভালবাস তাই বুঝি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়াছিলে? আমার আরসীতে মুখ দেখিয়াছিলে কি? কেমন সে মুখ? তাহার

প্রতিবিম্ব কেন আরসীতে রাখিয়া যাও নাই? তাহা হইলে ত আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

ওগো রহস্যময়ি, দেখা দাও! এই সুন্দর সুকোমল চুলগাছি যে-তরুণ তনুর শোভাবর্ধন করিয়াছিল সেই দেহখানি আমাকে একবার দেখাও। আমি যে তোমায় ভালবাসি। তুমি নারী তাহা জানিবার পূর্ব হইতেই যে তোমায় ভালবাসি।

কেমন তোমার রূপ? যে-শিমুল ফুল দিয়া প্রথম আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে তাহারই মত দিক্‌-আলো-করা রূপ কি তোমার? তাই কি নিজের রূপের প্রতিচ্ছবিটি সেদিন আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে? অধর কি তোমার অমনই রক্তিম বর্ণ, পায়ের আলতা কি উহারই রঙে রাঙা।

কেমন করিয়া কোন্ ভঙ্গীতে বসিয়া তুমি আমার চিরুণী দিয়া চুল বাঁধিয়াছিলে? কেমন সে কবরীবন্ধ! একটি রক্তরাঙা শিমুল ফুল কি সেই কবরীতে পরিয়াছিলে?

আমার এই ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কখনও আমি নারীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি নাই। আজ তোমাকে না দেখিয়াই তোমার প্রেমে আমি পাগল হইয়াছি। ওগো অশরীরিণি, একবার রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

২৪ ফেব্রুয়ারী। তাহার প্রেমের মোহে আমি ডুবিয়া আছি। আহার নিদ্রায় আমার প্রয়োজন কি? আমার মনে হইতেছে এই অপরূপ ভালবাসা আমাকে জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, আমার অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা জীর্ণ করিয়া জঠরস্থ অম্লরসের মত আমাকে পরিপাক করিয়া ফেলিতেছে। এমন না হইলে ভালবাসা?

২৫ ফেব্রুয়ারী। আজ সকালে হঠাৎ মালিটার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। মানুষের মুখ আমি দেখিতে চাই না।

সমস্ত দিন কিছু আহার করি নাই। ভাল লাগে না—আহারে রুচি নাই। তা ছাড়া রান্নার হাঙ্গামা অসহ্য।

গরম পড়িয়া গিয়াছে। মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কাল সারা রাত্রি জাগিয়াছিলাম।

কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে কাল আমার পাশে আসিয়া শুইয়াছিল। স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহার অস্পষ্ট মধুর দেহ-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখিলাম শূন্য—কিছু নাই। জানি, সে আমার চোখে দেখা দিবার জন্য, আমার বাহুতে ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়া আছে। কিন্তু পারিতেছে না। তাহার এই ব্যর্থ আকুলতা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

মধ্যরাত্রি হইতে প্রভাত পর্যন্ত খোলা আকাশের তলায় পায়চারি করিয়াছি, সেও আমার পাশে পাশে বেড়াইয়াছে। তাহাকে বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কি করিলে তাহার দেখা পাইব। সে উত্তর দেয় নাই—কিংবা তাহার উত্তর আমার কানে পৌঁছায় নাই।

সকাল হইতেই সে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঐ রক্তরাঙা শিমুল গাছটার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চর্মচক্ষে তাহাকে দেখিতে পাওয়া কি সম্ভব নয়?

২৬ ফেব্রুয়ারী। না, রক্তমাংসের শরীরে তাহাকে পাইব না। সে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসিনী; স্থূল মর্তলোক হইতে আমি তাহার নাগাল পাইব না। আমার এই জড়দেহটাই ব্যবধান হইয়া আছে।

২৭ ফেব্রুয়ারী। আহার নাই নিদ্রা নাই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখিলাম! এ কি সত্যই আমি —না আর কেহ?

আমি তাহাকে চাই, যেমন করিয়া হোক চাই। স্থূল শরীরে যদি না পাই—তবে—

২৮ ফেব্রুয়ারী। হাঁ, সেই ভাল। আর পারি না।

শিমুল গাছের যে ডালটা কূপের মুখে ঝুঁকিয়া আছে তাহাতে একটা দড়ি টাঙাইয়াছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তাহার আসিবার সময় হইবে—তখন—

সখি আর দেরী নাই, আজ ফাগুনের সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিবে তুমি কবরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিও। তোমার রক্তরাঙা ফুলের থালা সাজাইয়া রাখিও। আমি আসিব। তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিব। আজ আমাদের পরিপূর্ণ মিলনরাত্রি···

বরদা আস্তে আস্তে ডায়েরি বন্ধ করিয়া বলিল,—এইখানেই লেখা শেষ!

জটিল ব্যাপার

একটা জটা জুটিয়াছিল।

পরচুলার ব্যবসা করি না; সখের থিয়েটার করাও অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছি। তাই, আচম্বিতে যখন একটি পিঙ্গলবর্ণ জটার স্বত্বাধিকারী হইয়া পড়িলাম তখন ভাবনা হইল, এ অমূল্য নিধি লইয়া কি করিব।

কিন্তু কি করিয়া জটা লাভ করিলাম সে বিবরণ পাঠকের গোচর করা প্রয়োজন; নহিলে বলা-কহা নাই হঠাৎ জটা বাহির করিয়া বসিলে পাঠক স্বভাবতই আমাকে বাজীকর বলিয়া সন্দেহ করিবেন। এরূপ সন্দেহভাজন হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে উক্ত জটা মাথায় পরিয়া বিবাগী হইয়া যাওয়াও ভাল।

রবিবার প্রাতঃকালে বহির্দ্বারের সম্মুখে মোড়ায় বসিয়া রোদ পোহাইতে ছিলাম। সাঁওতাল পরগণার মিঠে-কড়া ফাল্গুনী রৌদ্র মন্দ লাগিতেছিল না—এমন সময় এক গ্যাঁটা-গোঁটা সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—'বম্ মহাদেও, ভিখ্ লাও।'

বাবাজীর নাভি পর্য্যন্ত সর্পাকৃতি জটা দুলিতেছে, মুখ বিভূতি-ভূষিত। তবু ভক্তি হইল না, কহিলাম, 'কিছু হবে না।'

বাবাজী ঘূর্ণিত নেত্রে কহিলেন,—'কেঁও! তু ম্লেচ্ছ্ হ্যায়? সাধু-সন্ত নহি মান্তা?'

বাবাজীর বচন শুনিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, বলিলাম, 'নহি মান্তা।'

সাধুবাবা অট্টহাস্যে পাড়া সচকিত করিয়া বলিলেন, 'বাংগালী হ্যায়—বাংগালীলোগ ভ্রষ্ট হোতা হ্যায়!'

আর সহ্য হইল না; উঠিয়া সাধুবাবার জটা ধরিয়া মারিলাম এক টান।

কিছুক্ষণ দু-জনেই নির্ব্বাক। তার পর বাবাজী জটাটি আমার হস্তে রাখিয়া মুণ্ডিত শীর্ষ লইয়া দ্রুত পলায়ন করিলেন। রাস্তায় কয়েক জন লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল, বাবাজী কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না।

এক জন পথচারী সংবাদ দিয়া গেল,—লোকটা দাগী চোর, সম্প্রতি জেল হইতে বাহির হইয়া ভেক লইয়াছে। সে যা হোক, কিন্তু এখন এই জটা লইয়া কি করিব? সংবাদদাতাকে সেটি উপহার দিতে চাহিলাম, সে লইতে সম্মত হইল না।

হঠাৎ একটা প্ল্যান মাথায় খেলিয়া গেল—গৃহিণীকে ভয় দেখাইতে হইবে।

বাহিরে প্রকাশ না করিলেও আধুনিকা বলিয়া প্রমীলার মনে বেশ একটু গর্ব্ব আছে। গত তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে কখনও তাহাকে সেকেলে বলিবার সুযোগ পাই নাই। নিজেকে সে পুরুষের সমকক্ষ মনে করে, তাই তাহার লজ্জার বাড়াবাড়ি নাই; কোনও অবস্থাতেই লজ্জা বা ভয় পাওয়াকে সে নারীসুলভ লজ্জার ব্যতিক্রম মনে করে।

তার এই অসঙ্কোচ আত্মম্ভরিতা মাঝে মাঝে আমার পৌরুষকে পীড়া দিয়াছে, একটা অস্পষ্ট সংশয় কদাচিৎ মনের কোণে উঁকি মারিয়াছে—

ভাবিলাম, আজ পরীক্ষা হোক প্রমীলার মনের ভাব কতটা খাঁটি, কতটা আত্মপ্রতারণা।

জটা লুকাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতরটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম।

প্রমীলা বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের ঘরে বসিয়া আছে। তাহার হাতে একখানা চিঠি। নিশ্চয় জটা-ঘটিত গণ্ডগোল শুনিতে পায় নাই।

আমাকে দেখিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। মুখখানা গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু চাই?'

বলিলাম, 'না। কার চিঠি?'

'বাবার।'

'বাড়ীর সব ভাল?'

প্রমীলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। আমি ঘরময় একবার ঘুরিয়া বেড়াইয়া বলিলাম, 'আজ বিকেলে আমায় জংশনে যেতে হবে। রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে ফিরব।'

'বেশ।'

'রাত্রে একলাটি বাড়ীতে থাকবে, ভয় করবে না?'

'ভয়!' ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আমার ভয় করে না।'

'ভাল।' ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। হঠাৎ এত গাম্ভীর্য্য কেন?

যা হোক, আজ রাত্রেই গাম্ভীর্য্যের পরীক্ষা হইবে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বন্ধুর গৃহে খানিকটা ছাই লইয়া মুখে মাখিয়া ফেলিলাম; তারপর আলখাল্লা ও জটা পরিধান করিয়া আয়নায় নিজেকে পরিদর্শন করিলাম।

বন্ধু সপ্রশংসভাবে বলিলেন, 'খাসা হয়েছে, কার সাধ্যি ধরে তুমি দাগাবাজ ভণ্ডসন্ন্যাসী নও।—এক ছিলিম গাঁজা টেনে নিলে হ'ত না?"

'না, অভ্যাস নেই—' বলিয়া বাহির হইলাম।

নিজের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা বন্ধ। পিছনের পাঁচিল ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

শয়নঘরে আলো জ্বলিতেছে। দরজার বাহির হইতে উঁকি

মারিয়া দেখিলাম, প্রমীলা আলোর সম্মুখে ইজি-চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম, 'হর হর মহাদেও।'

প্রমীলার হাত হইতে শেলাই পড়িয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চমকিত কণ্ঠে বলিল, 'কে?'

আমি খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'বম্ শঙ্কর। জয় চামুণ্ডে!'

প্রমীলা বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভয় পাইয়া পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না। তার পর সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া নিজের বুকের উপর হাত রাখিল। 'সুরেশদা, তুমি এ বেশে কেন?'

ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম। সুরেশদা! আমি পাকা সন্ন্যাসী, আমাকে সুরেশদা বলে কেন?

প্রমীলা স্খলিতস্বরে বলিল, 'সুরেশদা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কেন এলে?—তোমাকে আমি বলেছিলুম আর আমার কাছে এস না, তবু তুমি এখানে এলে?'

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সুরেশ প্রমীলার বাপের বাড়ীর বন্ধু, বোধ হয় একটু সম্পর্কও আছে। লোকটাকে আমি গোড়া হইতে অপছন্দ করিতাম; প্রমীলার সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা যে এত দূর—

ভাঙা গলায় বলিলাম, 'প্রমীলা—আমি—'

প্রমীলা দুই মুঠি শক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'না না, তুমি যাও সুরেশদা, ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। আগেকার কথা ভুলে যাও। এখন আর আমি তোমার কাছে যেতে পারব না।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'প্রমীলা, এক দিনের জন্যেও কি তুমি আমাকে ভাল—'

'বাসতুম। এখনও বাসি। কিন্তু তুমি যাও সুরেশদা, দোহাই তোমার—এখনই বাড়ীর মালিক এসে পড়বে—সর্ব্বনাশ হবে।'

আমি তাহার কাছে ঘেঁষিয়া গেলাম কিন্তু সে সরিয়া গেল না, উত্তেজনা-অধীর স্বরে বলিল, 'যাবে না? আমার গালে চূণকালি না মাখিয়ে তুমি যাবে না? তোমার পায়ে পড়ি সুরেশদা, এখনই সে এসে পড়বে। তবু দাঁড়িয়ে রইলে? আচ্ছা, এবার যাও—' সহসা সে আমার ভস্মলিপ্ত অধরে চুম্বন করিল—'এস'। আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি হতভম্বের মত চলিলাম।

খিড়কির দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রমীলা বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি ক'রো না। যদি থাকতে না পার, চিঠি দিও—ও আমার চিঠি পড়ে না। কিন্তু এমন ভাবে আর কখনও আমার কাছে এস না। মনে রেখ, যত দূরেই থাকি আমি তোমারই, আর কারুর নয়।'

অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মনে হইল সে উচ্ছ্বসিত কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

নিজের খিড়কির দরজা দিয়া চুপি চুপি চোরের মত বাহির হইয়া গেলাম।

* * * * *

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল।

কিন্তু তবু, চিরদিন অন্ধের মত প্রতারিত হওয়ার চেয়ে এ ভাল।

প্রমীলার চুম্বন আমার অধরে পোড়া ঘায়ের মত জ্বলিতেছিল, তাহার কথাগুলো বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। 'ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে—' কিরূপ সম্পর্কের

ইঙ্গিত এই কথাগুলার মধ্যে রহিয়াছে? 'বাসতুম—এখনও ভালবাসি'—আমার সঙ্গে তবে এই তিন বৎসর ধরিয়া কেবল অভিনয় চলিয়াছে! 'আমি তোমারই, আর কারুর নয়'—হুঁ, স্বামী শুধু বিলাসের সামগ্রী জোগাইবার যন্ত্র! উঃ! এই নারী! আধুনিকা শিক্ষিতা নারী!

বন্ধুর গৃহে ফিরিলে বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল! বিদুষী বৌ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কি রকম অভ্যর্থনা করলে?'

মুখের ছাই ধুইতে ধুইতে বলিলাম, 'ভাল।'

'দাঁত কপাটি লেগেছিল?'

মনে মনে বলিলাম 'লেগেছিল, আমার।'

স্থির করিলাম, নাটুকে কাণ্ড ছোরাছুরি আমার জন্য নয়। প্রমীলা কতখানি ছলনা করিতে পারে আজ দেখিব; তার পর তাহার সমস্ত প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিব। ভদ্রলোক ইহার বেশী আর কি করিতে পারে? ইহার পরও যদি প্রমীলা তাহার আধুনিক কাল্‌চারের দর্প লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে ত পারুক। রোহিণী-গোবিন্দলালের থিয়েটারি অভিনয় করিয়া আমি নিজেকে কলঙ্কিত করিব না।

বাড়ী গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িলাম। প্রমীলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখ প্রশান্ত, চোখের দৃষ্টিতে গোপন অপরাধের চিহ্ন মাত্র নাই।

সে বলিল, 'এরই মধ্যে ষ্টেশন থেকে এলে কি ক'রে? এই ত পাঁচ মিনিট হ'ল ট্রেন এল, আওয়াজ শুনতে পেলুম।'

জুতা জামা খুলিতে খুলিতে বলিলাম, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এলুম—তুমি একলা আছ!' প্রথমটা আমাকেও ত অভিনয় করিতে হইবে!

'কিছু খাবে নাকি? দুধ মিষ্টি ঢাকা দিয়ে রেখেছি।'

'না—খেয়ে এসেছি।' টেবিলের উপর আলোটা বাড়াইয়া দিয়া চেয়ারে বসিলাম।

'শোবে না? আলো বাড়িয়ে দিলে যে!'

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার কণ্ঠস্বরে, মুখের ভঙ্গিমায়, দেহের সঞ্চালনে, কোন একটা নির্দ্দেশক চিহ্ন খুঁজিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য তাহার অভিনয়, চক্ষের পলকপাতে তাহার মনের কথা ধরা গেল না।—এমনি করিয়াই এত দিন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উঃ—

বলিলাম, 'আলো বাড়িয়ে দিলুম তোমার মুখ ভাল করে দেখব বলে।'

সে গ্রীবাভঙ্গী সহকারে হাসিয়া বলিল, 'কেন, আমার মুখ এই প্রথম দেখছ নাকি?'

বলিলাম, 'না। কিন্তু মুখ কি ইচ্ছে করলেই দেখা যায়! আমার মুখ তুমি দেখতে পেয়েছ?'

'পেয়েছি। এত রাত্রে আর হেঁয়ালি করতে হবে না—শুয়ে পড়।—আমি আসছি।'

পাশের ঘরে গিয়া অতি শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। 'এখনও শোও নি? শীতও করে না বুঝি! আমি বাপু ছেলেমানুষ, আর দাঁড়াতে পারব না।' একটু হাসিল।

তার পর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'ওগো এস, শুয়ে পড়ি।'

এত ঘনিষ্ট, এত অন্তরঙ্গ এই কথা কয়টি, যে আমার হঠাৎ ধোঁকা লাগিল—আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন নয় ত?

'প্রমীলা!'

শঙ্কিত চক্ষে চাহিয়া সে বলিল, 'কি গা!'

আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, 'না, কিছু নয়। শুয়ে পড়াই যাক, রাত হয়েছে।'

শয়ন করিবার পর কিয়ৎকাল দু-জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। পাশাপাশি শুইয়া দুই জন মানুষের মধ্যে কতখানি লুকোচুরি চলিতে পারে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

হঠাৎ প্রমীলা বলিল, 'আজ সন্ধ্যের পর কানন বেড়াতে এসেছিল।'

'কানন?'

'হ্যাঁ গো—কাননবালা। যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—এমন মনেই পড়ছে না?'

গম্ভীরভাবে বলিলাম, 'ভালবাসতুম না, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'ঐ হ'ল। সে দু-তিন দিন হ'ল বাপের বাড়ী এসেছে; আজ এ বাড়ীতে এসেছিল। তার সঙ্গে অনেক গল্প হ'ল।'

'কি গল্প হ'ল?'

'তুমি কবে একবার কালিঝুলি মেখে ভুত সেজে রাত্রে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিলে, সেই গল্প বললে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, 'আর কি বললে?'

'আরও অনেক গল্প। আচ্ছা, রাত দুপুরে সোমত্ত মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলে কেন বলত?'

'ভয় দেখাবার জন্যে।'

'আর কোন মতলব ছিল না?'

মাথায় রাগ চড়িতেছিল। প্রমীলা আমার খুঁত ধরিতে চায় কোন স্পর্দ্ধায়? অথবা ইহাও ছলনার একটা অঙ্গ?

গলার স্বরটা একটু উগ্র হইয়া গেল—'না। তবে তুমি অন্য কিছু ভাবতে পার বটে!'

'কেন?'

আমি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম, 'প্রমীলা!'

'কি ?'

'তোমার সুরেশদা এখন কোথায় ?'

ক্ষীণস্বরে প্রমীলা বলিল, 'সুরেশদা !'

'হ্যাঁ—সুরেশদা—যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—মনে পড়ছে না ?'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রমীলা ধীরে ধীরে বলিল, 'পড়ছে। তাঁকে বিয়ের আগে ভালবাসতুম, এখনও বাসি।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার মুখের উপর একথা বলিতে বাধিল না ?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'তোমার এই সুরেশদা এখন কোথায় আছেন বলতে পার ?'

'পারি ! তুমি শুনতে চাও ?'

'বল। তোমার মুখেই শুনি।'

প্রমীলা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল, 'তিনি স্বর্গে।'

'স্বর্গে ?—মানে ?'

প্রমীলা ভারী গলায় বলিল, 'আজ সকালে বাবার চিঠি পেয়েছি, সুরেশদা মারা গেছেন। তুমি সুরেশদাকে পছন্দ করতে না তাই তোমাকে বলি নি।' হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, 'সুরেশদা দেবতার মত লোক ছিলেন, আমাকে মা'র-পেটের-বোনের চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন।'

মাথাটা পরিষ্কার হইতে একটু সময় লাগিল।

প্রমীলা আমার গায়ে হাত রাখিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, 'এবার ঘুমোও।' তারপর নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি ক'রো না। মনে রেখ আমি তোমারই, আর কারুর নয়—'

কেতুর পুচ্ছ

ডাক্তার অমিতাভ মিত্রের বয়স আটাশ বৎসর। মাত্র দুই বৎসর হইল সে কলেজ ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে সহরে বেশ পশার জমাইয়া তুলিয়াছে। সহরটি বেশ বড় এবং তাহাতে বহুমারী প্রবীণ চিকিৎসকের অভাব নাই—তবু—

ইহাকেই বলে ভাগ্য।

অমিতাভ বেশ চটপটে; নাকে মুখে কথা। চেহারাও মন্দ নয়, বলিষ্ঠ দোহারা লম্বা—মাথায় কোঁকড়া চুল। ঠোঁটের গড়ন এমন যে মুহূর্ত্তমধ্যে চটুল ঠাট্টার ভঙ্গি হইতে গভীর সমবেদনায় নতপ্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে। চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিতে প্রখর, নাকের ডগা হঠাৎ একটু উঁচু হইয়া গিয়া মুখখানাতে একটা ধৃষ্ট ডেঁপোমির ভাব আনিয়া দিয়াছে।

সহরের ঈর্ষ্যাপরবশ শতমারীরা তাহাকে 'ডেঁপো ছোঁড়া' বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোগীর অভিভাবকরা তাহার কথা শুনিয়া অর্দ্ধেক উদ্বেগ ভুলিয়া যাইতেন; শয্যাশায়ী রোগী তাহাকে দেখিয়া পাংশুমুখে হাস্য করিত।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, কেবলমাত্র ভাগ্যের জোরেই অমিতাভ দুই বৎসরের মধ্যে সহরে পসার জমাইয়া তুলে নাই।

সেদিন সকালে আটটার সময় নিজের ডিসপেন্‌সারির খাশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া অমিতাভ দেখিল এক ভীমকান্তি বিরাট উদরবিশিষ্ট রোগী অত্যন্ত মচ্ছিভঙ্গ ভাবে বসিয়া আছেন। রোগীটি অমিতাভের পরিচিত; প্রায় প্রত্যহই প্রভাতে আসিয়া নিজ দেহের নানা বিচিত্র

লক্ষণ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্যবস্থা লইয়া গিয়া থাকেন। ইনি জাতিতে স্বর্ণকার।

অমিতাভ বলিল,—'এই যে বিশ্বম্ভরবাবু! আজ কেমন আছেন?'

মুমূর্ষু কণ্ঠে বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন,—'বড় খারাপ। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না ডাক্তারবাবু।'

অমিতাভ মুখখানা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিল। বলিল,—'তাই ত! আপনাকে আজ যেন কেমন একটু রোগা-রোগা দেখছি। কি হয়েছে বলুন ত! আবার কান কট্‌কট্‌ করছে নাকি?'

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বিশ্বম্ভরবাবু মাথা নাড়িলেন,—'না। কাল রাত্রে দু'বার ঢেকুর উঠেছে; একবার এগারোটা বেজে সাত মিনিটে, আর একবার দু'টো বাজতে উনিশ মিনিটে!'

'বলেন কি! এ ত ভাল কথা নয়। দেখি আপনার নাড়ী।'

বিষণ্ণমুখে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার বজ্রমুষ্টি অগ্রসর করিয়া দিলেন। নাড়ী দেখিয়া অমিতাভ বলিল, 'হুঁ। কাল রাত্রে কি খেয়েছিলেন?'

কাতরকণ্ঠে বিশ্বম্ভরবাবু আহারের যে ফর্দ্দ দিলেন তাহা শ্রবণ করিলেই সহজ মানুষের অজীর্ণরোগ জন্মে। অমিতাভ কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল,—'তাইত! এমন কিছু গুরুভোজন ত হয় নি, যার জন্যে রাত্রে দু'বার ঢেকুর উঠতে পারে। তবে কেন এমন হল?'

বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'ডাক্তারবাবু, আমি কি সত্যিই বাঁচব না?'

ঈষৎ হাসিয়া অমিতাভ বলিল,—'আপনি ভয় পাবেন না। আপনার মত লোক যদি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে আমরা আছি কি জন্যে? একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, সেইটে খাবার পর দু'বেলা ব্যবহার করুন। ওষুধটা অবশ্য দামী—'

'কত দাম?'

'সাড়ে তিন টাকা পড়বে।'

'বেশ, লিখে দিন। প্রাণের কাছে সাড়ে তিন টাকা আর কি বলুন!' বলিয়া বিশ্বম্ভর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

টাকাডায়েস্‌টেস্‌, অ্যাকোয়া টাইকোটিস্‌ সহযোগে একটি হজমি প্রেস্‌ক্রিপশান লিখিতে লিখিতে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করিল,—'আজকাল আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'বেশ ভালই আছে।'

'কাসিটা এখনো যায়নি?'

'কাসে মাঝে মাঝে। কিন্তু সে কিছু নয়।'

'সন্ধ্যেবেলা জ্বর আসত, সেটা এখনো আসে নাকি?'

অনিচ্ছাভরে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'আসে হয়ত, ঠিক বলতে পারি না। আর মেয়েমানুষ—বুঝলেন না? অমন একটু আধটু—'

'সে ত বটেই!' প্রেস্‌ক্রিপশান বিশ্বম্ভরকে দিয়া অমিতাভ বলিল, 'তবে আমার মনে হয় তাঁকে কয়েকটা ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকশান দেওয়া দরকার। অবশ্য আপনার তুলনায় তাঁর অসুখ কিছুই নয়—তবু—'

বিশ্বম্ভর একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—'নিজের অসুখের চিকিচ্ছে করতে করতেই লম্বা হয়ে গেলাম ডাক্তারবাবু, তার ওপর আবার যদি—'

অমিতাভ জানিত বিশ্বম্ভরের লম্বা হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তবু সে বলিল,—'আচ্ছা, তাঁকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন, আমি এমনি ইন্‌জেকশান দিয়ে দেব। ওষুধের দামটা খালি দিতে হবে।'

বিশ্বম্ভরবাবু অপ্রসন্নমনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন,—'আচ্ছা দেখি।—ডাক্তারবাবু, আপনি দৈব ওষুধে বিশ্বাস করেন?'

অমিতাভ তৎক্ষণাৎ বলিল,—'হ্যাঁ করি বৈকি। তবে সামান্য অসুখে দৈব ওষুধ তেমন কাজ করে না। আপনি বরঞ্চ নিজে

ব্যবহার করতে পারেন, আপনার যে ব্যাধি তাতে দৈব ওষুধ অব্যর্থ কাজ করবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি ওষুধও খাওয়া চাই।'

বিশ্বম্ভর স্ত্রীর জন্যই দৈব ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডাক্তার যখন দৈব চিকিৎসায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিল তখন তাঁহার নিজের জন্যও লোভ হইল। দৈব ঔষধের মূল্য কম অথচ উহা মনকে শান্তি দিতে পারে। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এমন কাউকে জানেন ডাক্তারবাবু, যে মাদুলি-টাদুলি দিতে পারে? তাহলে হয়ত—'

এই সময় টেবিলের উপর টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। ফোন তুলিয়া লইয়া অমিতাভ বলিল,—'কে আপনি?... আরে বিন্দা! কি খবর?...যেতে হবে? কি হয়েছে? মীনা ভাল আছে ত? যাক, আমি ভেবেছিলুম মীনার বুঝি অসুখ করেছে...'

বিশ্বম্ভরবাবু মাদুলির কথা ভুলিয়া এই একতরফা আলাপ শুনিতে লাগিলেন।

'...সার্জ্জারি কেস! কার ওপর অস্ত্র করতে হবে?...অ্যাঁ... কেতু? মীনার—কি বললে—ছেলে?...ও বুঝেছি। তা বেশ। আট টাকার কমে আমি ছুরি ধরি না, কিন্তু এ কেসে ডবল ফী চার্জ্জ করব। রাজি আছ?...বেশ! মীনা কোথায়?...ঘরেই আছে? তাকে ফোন ধরতে বল।...ভাল আছ মীনা? তোমার ছেলের—অর্থাৎ কেতুর—বয়স কত হল? দু' মাস?...অ্যাঁ! কি বললে ভাল শুনতে পেলুম না। আমার মনে হল, তুমি বললে—ধ্যেৎ! ...যাহোক, এই মাসেই তোমার বিয়ে, তার আগে তোমার ছেলের রোগ সারিয়ে দিতে হবে—কেমন? কোনো ভয় নেই; অপারেশানটা অবশ্য গুরুতর কিন্তু আমি সারিয়ে তুলব।...ভাল কথা, তোমার ভাবী পতিদেবতা শুনলুম একজন তরুণ ডাক্তার;—লোকটি

বেশ উদার প্রকৃতির দেখছি···অভিনন্দন জানাচ্ছি, আশা করি তোমরা সুখী হবে। পরমেশ্বরের কাছে দম্পতীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি···না না রাগ নয়,—সে ত এর পরে সারা জীবন ধরেই আছে··· কিন্তু রবিবাবুর সেই কবিতাটা মনে আছে ত—'খ্যাতির ক্ষতি পূরণ-প্রতি দৃষ্টি রাখি হরিণ আঁখি'। আমিও এখন থেকে ক্ষতিপূরণের দাবী জানিয়ে রাখছি।···কিসের ক্ষতি! বল কি! যদি এখানকার লোক জানতে পারে যে ন্যায্য অধিকারীকে বঞ্চিত করে আমি এই অপারেশান করছি, তাহলে কি রক্ষে থাকবে? প্রফেশনাল এটিকেট আছে ত!···আচ্ছা, এখনি যাচ্ছি। তোমার বিয়েতে কি উপহার দেব ভাবছি; কি দিলে ভাল হয় বল ত? একটা কুমীরের চামড়ার সুটকেস?···না! এক সেট চায়ের বাসন? ···তাও না! তবে?···অ্যাঁ! একটা আস্ত মানুষ চাই!···আচ্ছা মীনা, তুমি দূর থেকে ত বেশ কথা কইতে পারো, মুখোমুখি হলে আর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না কেন?···লজ্জা! হুঁ—'আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান কেবল সরমটুকু রেখেছি'··· আহাহা—কবিতা বললে অমন চটে যাও কেন?···যাচ্ছি, পনেরো মিনিটের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুব···কেতুর বাবাকে আমার ভালবাসা দিও—,' অপরপ্রান্ত হইতে টেলিফোনের তার কাটিয়া গেল।

ফোন রাখিয়া দিয়া অমিতাভের চেতনা হইল যে বিশ্বম্ভরবাবু এতক্ষণ একাগ্র মনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। সে চট করিয়া মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া ফেলিল, বলিল,—'আমাকে এখনি বেরুতে হবে একটা শক্ত অপারেশান আছে।'

বিশ্বম্ভরবাবু কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কোথায় যেতে হবে?'

'বিনোদবাবু জমিদারের বাড়ী। তাঁর একটি ভাগ্নে—দু' মাসের

বাচ্ছা—তার মেরুদণ্ডের কয়েকটা হাড় কেটে বাদ দিতে হবে।—আপনি তাহলে ঐ ওষুধটা আপাতত চালান—'

অপারেশানের অস্ত্রাদি ব্যাগে লইয়া অমিতাভ তাহার দশ-মডেল অষ্টিন গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিল। বিশ্বম্ভরবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। জমিদার বিনোদবাবুর পরিবারস্থ সকলকেই তিনি চেনেন,—কেবল ভ্রাতা আর ভগিনী, আর কেহ নাই। উভয়েই অবিবাহিত। সম্প্রতি ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—এই সূত্রে বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় পনেরো হাজার টাকার গহনা সরবরাহ করিবার ফরমাস পাইয়াছেন।

অথচ—।

বিনোদ বলিল,—'ডাক্তারই বল আর গো-বদ্যিই বল, তুমি ছাড়া মীনার কারুর ওপর বিশ্বাস নেই।'

বিনোদের পড়ার ঘরে বিনোদ ও অমিতাভ মুখোমুখি বসিয়াছিল, মীনা দাদার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। ছোটখাট মেয়েটি, বয়স সতের কি আঠারো; সুন্দর চোখ দুটিতে আশঙ্কার ছায়া স্বাভাবিক লাজুকতার সহিত মিশিয়া তাহাকে যেন আরও ছেলেমানুষ করিয়া দিয়াছে।

অমিতাভ তাহার দিকে চোখ তুলিয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—'একেই বলে পূর্ব্বরাগ। ডাক্তারের কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু গো-বদ্যির চেয়েও আমার ওপর বেশী বিশ্বাস,—খাঁটি ভালবাসা না হলে এমন হয় না।'

মীনা উত্তপ্ত মুখে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল। অমিতাভ যদিও তাহার দাদার কলেজের বন্ধু, (উভয়ে এক সঙ্গে আই-এস্-সি পড়িয়াছিল) তবু অমিতাভের সান্নিধ্যে আসিলে সে কেবলই ঘামিতে

থাকে। ফোনে যদ্দিবা তাহার দু'একটা ঠাট্টার জবাব দিতে পারে, চোখাচোখি হইলে একেবারে বোবা হইয়া যায়।

অমিতাভ বলিল,—'বিন্দা দেখছ, মীনার কি রকম লজ্জা হয়েছে! তোমার সামনে প্রেমের কথা উত্থাপন করা আমার উচিত হয়নি। প্রেম হচ্ছে ভারি গোপনীয় জিনিস, দাদার সামনে তা নিয়ে আলোচনা অতি গর্হিত, আড়ালে আবডালে চুরি করেই প্রেমের কথা বলতে হয়। অতএব ও কথা এখন থাক। এখন তোমার সংসারের খবর কি মীনা? তোমার বিলিতি ইঁদুরগুলি বেশ মনের আনন্দে আছে? রূপী বাঁদরটির স্বাস্থ্যের কোন রকম ব্যাঘাত হয়নি?'

বিনোদ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—'আঃ, অমি, ওকে আর জ্বালাতন করিসনি। এমনিতেই বেচারা কাল থেকে দুর্ভাবনায় শুকিয়ে উঠেছে। এখন যা, কাজটা সেরে আয়।'

'তথাস্তু।' অমিতাভ ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—'তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল মীনা। বিন্দা, তুমি আসবে না?'

'না, এখনি একজন লোক আসবার কথা আছে।'

'উঃ—কি পাষণ্ড! ভাগ্নের চেয়ে লোক বড় হল!' অমি হৃদয়-বিদারক নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—'বেশ! বেশ! চল মীনা।'

অন্দরের একটি রুদ্ধদ্বার ঘরের সম্মুখে আসিয়া মীনা দাঁড়াইল, অমিতাভের মুখের দিকে কাতর চোখ তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—'বাঁচবে ত?'

চমকিত হইয়া অমি বলিল,—'কে?'

ভর্ৎসনাপূর্ণ চোখে মীনা বলিল,—'কেতু।'

অমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল,—'কোনো ভয় নেই, আমার অস্ত্রাঘাতে আজ পর্য্যন্ত কেউ মরেনি। একবার একটা হুলো বেরালকে

লাঠি মেরেছিলুম, সে আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছে।—এই ঘরে কেতু আছে ত? তুমিও এস না।'

মীনা শিহরিয়া উঠিল,—'আমি ও চোখে দেখতে পারব না।' বলিয়া চোখে আঁচল দিল।

অমি বলিল,—'আচ্ছা তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাক; এক মিনিটে কাজ শেষ হয়ে যাবে।—কিন্তু ক্ষতিপূরণের কথাটা মনে আছে ত? তোমার দাদা অবশ্য ডবল ফী দেবে বলেছে, কিন্তু বিন্দাকে বিশ্বাস নেই; শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ফাঁকি দেবে। তখন কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি ক্ষতিপূরণ আদায় করব।'

আঁচলের ভিতর হইতে মীনা বলিল,—'যাও।'

অমি একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

'অগ্রিম কিছু আদায় করে নিই।'—অমি চট্ করিয়া তাহার সিঁথি-মূলে একটা চুম্বন করিল, তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রক্ত করবীর মত রাঙা মুখ দুহাতে চাপিয়া মীনা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। ছি ছি—একটু লজ্জাও কি নাই! বিয়ের আগে—

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধ। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। মীনা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। কেতু কি—?

তারপর সহসা ঘরের ভিতর হইতে তারস্বরে চীৎকার উঠিল—কেঁউ কেঁউ কেঁউ।

ক্রমশ কুক্কুর শাবকের কাতরোক্তি ক্ষীণ হইয়া থামিয়া গেল। মিনিট দুই তিন পরে অমি বাহিরে আসিতেই মীনা ব্যাকুল বিস্ফারিত চক্ষে তাহার পানে তাকাইল।

অমি নিজের মুঠি তাহার দিকে বাড়াইয়া বলিল,—'এই নাও।'

না বুঝিয়া মীনা হাত পাতিল। কেতুর কর্ত্তিত পুচ্ছটি তাহার

হাতে দিয়া অমি বলিল,—'অপারেশান্ সাক্‌সেস্‌ফুল। রোগী এখন নিদ্রা যাচ্ছেন।'

মীনা ল্যাজটি ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল; তারপর ঘরে গিয়া ঢুকিল। অতর্কিতে অমির পিঠে একটি কিল মারিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল।

অমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ক্ষুদ্র পুচ্ছাংশটি পকেটে পুরিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে বাহিরের দিকে চলিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া অমি দেখিল বিশ্বম্ভরবাবু বিনোদের কাছে বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল,—'একি! বিশ্বম্ভরবাবু আপনি এখানে যে?'

বিনোদ বুঝাইয়া দিল যে বিশ্বম্ভরবাবু মীনার বিবাহের সমস্ত গহনা গড়ার ভার লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এ বাড়ীতে যাতায়াত বিচিত্র নয়।

অমিতাভ কিছুকাল অপলক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্বম্ভরবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল,—'এদিকে একবার শুনে যান, একটু কথা আছে।'

বিশ্বম্ভরকে আড়ালে লইয়া গিয়া অমি বলিল,—'আপনি আজ মাদুলি ধারণের কথা বলছিলেন না? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার কাছে ভাল দৈব ওষুধ আছে।'

বিশ্বম্ভর উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অমি গম্ভীর মুখে বলিল,—'কেতু গ্রহই আপনার অনিষ্ট করছে; কেতুর মাদুলি ধারণ করলেই আর কোনো রোগ থাকবে না।'

সাগ্রহ স্বরে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'কি করতে হবে?'

পকেটে হাত পুরিয়া কেতুর পুচ্ছটি নাড়িতে নাড়িতে অমি বলিল,

—'একটি বেশ বড় দেখে সোনার মাদুলি তৈরি করে কাল আপনি আমার কাছে নিয়ে যাবেন, আমি তাতে দৈব ওষুধ ভরে দেব। মাদুলিটি অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা হওয়া চাই, আর সেই অনুপাতে মোটা। সেটি গলায় ধারণ করতে হবে।'

হাত ঘষিতে ঘষিতে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'যে আজ্ঞে।'

'আর আপনার স্ত্রীকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন, ইন্‌জেকশান দিয়ে দেব।'

ঈষৎ ম্লান হইয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'আচ্ছা।'

'আপনি যখন এ বাড়ীর স্যাকরা তখন ওষুধের দামটা আর আপনাকে দিতে হবে না।'

পুনরায় উৎফুল্ল হইয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'যে আজ্ঞে।'

মনে মনে

দ্বিজেনের কথা

আজ অফিস থেকে বাড়ী ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে গেল।

মীনা দেরী হওয়া ভালবাসে না—তার মুখ একটু ভার হয়, চোখে গাম্ভীর্য্য ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে ত কিছু বলবে না—কেবল ভেতরে ভেতরে জট পাকাবে। আশ্চর্য্য মেয়েমানুষের স্বভাব। এই পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে একদিনও মীনা ঝগড়া করলে না; রাগ হলেই মুখ টিপে থাকে, শুধু আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে, রাগ হয়েছে। কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা বিগ্রহো যত্র মৌনম্—

কিন্তু আজ আর রাগ হতে দিচ্ছি না। দেরী হবার কারণটা পকেট থেকে বার ক'রে অন্যমনস্কভাবে টেবলের ওপর রাখলেই রাগ গ'লে জল হয়ে যাবে।

আজ অফিসে মাইনে পেলুম। পথে আসতে আসতে ভাবলুম, টাকা বাড়ী নিয়ে গেলে ত কিছুই থাকবে না, তার চেয়ে এই বেলা মীনার জন্যে একটা কিছু সৌখীন জিনিষ কিনে নিয়ে যাই। সামনেই হীরালাল মতিলালের দোকানটা পড়ল—সেখানেই ঢুকে পড়লুম। বেশী কিনিনি, সামান্য ১৫৲ টাকা দামের একটি ব্রুচ—কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে। মীনা খুসী হবে।

বাড়ীতে ঢুকে দেখলুম, মীনা একটা ডেক-চেয়ারে ব'সে নভেল পড়ছে। আমাকে দেখে ঘড়ির দিকে তীক্ষ্ণভাবে একবার তাকিয়ে বই নামিয়ে রেখে বললে,—"এলে?"

এই ধরনের কথা আমার ভাল লাগে না। এলে? তার মানে

কি? আমার আসাটা কি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, না আমার আজ ফেরবার কথাই ছিল না? আসলে খোঁচা দিয়ে কথা কওয়া মীনার একটা স্বভাব। আর দেরী হয়েছে ত হয়েছে কি? ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরব এমন লেখাপড়া ত কিছু করিনি।

একটা কোঁচান কাপড় হাতের কাছে রেখে—'কাপড় ছাড়ো'—ব'লে মীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অর্থাৎ আমার ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন সেটা জানিয়ে দিয়ে যাওয়া হল। বেশ, বিরক্ত হয়েছেন তা আর কি করব! তাই বলে আমি ত ঘড়ির কাঁটার মত চলতে পারি না। কলের পুতুল ত নই!

জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে বসেছি, মীনা খাবার আর চা নিয়ে এসে সামনে রাখলে। আজ দেখছি আবার মোহনভোগ তৈরী হয়েছে। মনে আছে তা হলে। যাক ক্ষিদেটাও খুব পেয়েছে······

ও—তাই বলি। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। বোধ হয় দুপুর বেলা কোনও সময় অবসর মত তৈরী ক'রে রাখা হয়েছিল। তা ত হবেই আমি মুটে-মজুর লোক, খেটে-খুটে এসে ঠাণ্ডা বাসি যা পাব তাই দিয়ে পেটের গর্ত্ত বুজিয়ে ফেলব, খাবার একটা কিছু পেলেই হ'ল, এর বেশী প্রত্যাশা করাই অন্যায়······যাক তবু চা'টা একটু গরম আছে। কি দরকার ছিল? ওটাও দুপুরবেলা তৈরী ক'রে রাখলেই হ'ত।

"আজ তোমার মাইনে পাবার দিন না?"

হুঁ—সে কথাটি মনে আছে। পকেট থেকে বার ক'রে দিয়ে বললুম,—"এই নাও।"

টাকা গুণে ভুরু তুলে বললে,—"পনের টাকা কম যে?"

কৈফিয়ৎ চাই! নিজের টাকা যদি খরচ করি, তাও পাই-

পয়সার হিসেব দিতে হবে; দূর ছাই, সংসার করাই একটা ঝকমারি।

বললুম,—"খরচ করেছি।"

সপ্রশ্নভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইল—অর্থাৎ এখনও কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হয় নি; কিসে খরচ করেছি, তা বলতে হবে! মীনার কি বিশ্বাস, আমি মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে দিয়েছি! না তার চেয়েও সাংঘাতিক আরও কিছু!

উঃ! মেয়েমানুষের মতন সন্দিগ্ধ মন পৃথিবীতে আর নেই। না, আমি বলব না, কিছুতেই বলব না,—দেখি, ও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে কি না। যদিও জানি, তা কখনই করবে না; মনে মনে গেরো দেওয়া যে ওর স্বভাব।

জিজ্ঞাসা করলে কি অপমান হ'ত, না আমি মিথ্যে কথা বলতুম! জিজ্ঞাসা করলেই ত আমায় বলতে হ'ত যে, তোমার জন্যে গহনা কিনেছি।—বেশ ভালই হ'ল। কাল ঐ লক্ষ্মীছাড়া ব্রুচটা ফেরৎ দিয়ে আসব—বলব, পছন্দ হ'ল না। মন্দ কি, ক'টা টাকা বেঁচে গেল।

টাকা নিয়ে দুপ্ দুপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দমাস ক'রে আলমারির দরজা বন্ধ করা হ'ল; মানে, আমি কি রকম চটেছি, তুমি দেখ!

ফিরে এসে আবার দূরের একটা চেয়ারে বসল। মুখে কথা নেই, আমাকে দেখেই বোধ হয় সব কথা ফুরিয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট দুজনে চুপ-চাপ আছি। ওঁর বোধ হয় আশা যে আমিই আগে কথা কইব। কিন্তু—কেন কইব? আমাকেই চিরদিন আগে কথা কইতে হবে, তার কি মানে?

অনেকক্ষণ পরে কথা কইলেন,—"খবরের কাগজ পড়বে?"

হুঁ—খবরের কাগজ পড়ব। সোজা কথায় বললেই হয়, তোমার

সংসর্গ আমার ভাল লাগছে না, তুমি যা হয় কর, আমি উঠে যাই। সমস্ত দিনের পর বাড়ী আসার কি চমৎকার সম্বর্দ্ধনা! বোধ হয় নভেলটা শেষ হয়নি, তাই প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে। তা আমি ত ধ'রে রাখিনি; 'ওগো, তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না' ব'লে কাঁদিও নি। গেলেই পারেন, ছুতো খোঁজবার দরকার কি?

মেয়েমানুষ জাতটার মত এমন কপট আর—; দূর হোক গে, এই জন্যেই লোকে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আমারও আর ভাল লাগ্‌ছে না, অরুচি ধ'রে গেছে।

যাই, খানিকটা বেড়িয়ে আসি। বাড়ী ত নয়—সাহারা। এরই জন্যে মানুষ পাগল!

উঠে জামা পরতে পরতে বললুম,—"বেড়াতে যাচ্ছি।"

কোনও জবাব নেই। বহুত আচ্ছা, তাই সই। যখন জুতো প'রে ছড়ি নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, তখন,—"বামুন ঠাকুরের আজ দুপুর থেকে জ্বর—"

বামুন ঠাকুরের জ্বর, তা আমি কি করব? আমি ধন্বন্তরি না কি? আসলে তা নয়, কথার তাৎপর্য্যটা গভীর—অনেক দূর থেকে আসছে; কোনও কোনও দিন বেড়িয়ে বাড়ী ফিরতে রাত্রি ন'টা বেজে যায়—আড্ডায় বসলে সহজে ওঠা যায় না—তাই চেতিয়ে দেওয়া হ'ল। আজ উনি নিজে রাঁধবেন, আজ যেন ফিরতে দেরী না করি। আমার যেন নারী-শাসন তন্ত্রে বাস হয়েছে—সব সময় কড়া শাসন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেশবারও হুকুম নেই। বেশ, তাই হবে। সন্ধ্যে থেকেই ঘরের মধ্যে ঢুকে ব'সে থাকব।

'বুঝেছি' ব'লে বেরিয়ে পড়লুম।

* * *

ঠিক ন'টার সময় বাড়ী ফিরলুম। দেখি, গিন্নী রান্নাবান্না শেষ

ক'রে ব'সে আছেন। তখনই খেতে ব'সে গেলুম। কি জানি, যদি দেরি করি, আবার গোসা হ'তে কতক্ষণ!

না, গিন্নীটি আমার রাঁধেন ভাল। এই রান্নাই ত বামুনঠাকুর রাঁধে,—কিন্তু সে যেন যাচ্ছেতাই।

আমি ত কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, তবে মীনা একটুতেই অমন মুখ অন্ধকার করে কেন? যেন কত বকেছি। আচ্ছা, আমারই না হয় ঘাট হয়েছে, আমিই যেচে ভাব করছি।

খেয়ে উঠে মীনার হাত থেকে পান নিতে নিতে বললুম,—"উঃ—আজ কি গরম। রাত্রে ঘুম হ'লে হয়।"

মীনা মুখ টিপে বললে,—"বেশ, আমি না হয় মেঝেয় মাদুর পেতে শোব।"

কি কথার কি উত্তর!

নাঃ—এদের মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ—এরা সোজা কথা বলতে জানে না। উনি আমার পাশে শোন্, তাই আমার গরম লাগে, অতএব মেঝেয় মাদুর পেতে শোবেন! এত দিন যেন—কিন্তু কুছ পরোয়া নেই, সেই ভাল। একলা শুতে চান, আমার আপত্তি কি? আমিই না হয় নীচে বসবার ঘরে তক্তপোশের ওপর শোব। কারুর কোনও অসুবিধে নেই—সব দিক দিয়েই ভাল। উনি সমস্ত ওপরতালাটা নিয়ে থাকুন।

বললুম,—"আমিই নীচে তক্তপোশে শোব। তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

তক্তপোশের ওপর নিজেই চাদর পেতে শুয়ে পড়লুম—কারুর সাহায্যের তোয়াক্কা রাখি না। উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলবার ভান ক'রে ওপরে চ'লে গেলেন।

দুনিয়াটাই ফাঁকি। এই যে দশটা পাঁচটা অফিস করি,—কিসের

জন্যে? এই ঘর-দোর বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রীপরিবার—সব মিথ্যে! মায়া! বেদান্ত ঠিক বলেছে—মায়া—

ঘুম আসছে, রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। ঘুমুই—দুত্তোর, কি হবে ও কথা ভেবে! যত সব……

অ্যাঁ!—কে—!

মিনতির কথা

সত্যি বাপু, এত দেরীই বা হয় কেন? পাঁচটার সময় ত অফিসের ছুটী হয় তবে এতক্ষণ কি করেন? সারা দিনের পর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে ইচ্ছেও হয় না?

আমরাই শুধু ভেবে মরি। মেয়েমানুষ কি না! পুরুষমানুষের ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই। আমি যে সারাদিন একলা প'ড়ে থাকি, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। থাকবে কেন? দাসীবাঁদীকে কে কবে ভ্রূক্ষেপ করে!

আচ্ছা, এতক্ষণ কি করেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান? বিশ্বাস হয় না। তবে? কি জানি, বুঝতেও পারি না; ভাবতেও ভাল লাগে না।

আজ সকাল সকাল খাবার তৈরী ক'রে চায়ের জল চড়িয়ে রেখেছি—ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারেন না, আবার খাবার দিতে দেরী হলেও বিরক্ত হন—কিন্তু বুঝে বুঝে আজই দেরী করছেন। জানি ত ওঁকে—মাথার টনক নড়ে। আজ আমি ঠিক পাঁচটার সময় গরম খাবার তৈরী ক'রে রেখেছি কি না—আজ বোধ হয় ছ'টার আগে বাড়ী ঢোকাই হবে না।

কিছু বলতেও ভয় করে—এমন মুখ ভারী ক'রে থাক্‌বেন, যেন কি ভয়ানক অন্যায় কথাই বলেছি। কিছুটি বলবার জো নেই, অমনি পুরুষমানুষের পৌরুষে ঘা লাগবে। মুখ এতখানি হয়ে উঠবে।

ও রকম মুখ অন্ধকার ক'রে থাকার চেয়ে বকাও ভাল। কেন বকেন না? বকলেই পারেন, ওরকম মুখ বুজে শাস্তি দেওয়া আমি সইতে পারি না।

ছ'টা বাজল, এখনও দেখা নেই। খাবারগুলো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কেন যে এত ক'রে মরি, তাও জানি না। স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া, মনে দুঃখ দেওয়া ওদের স্বভাব। যাই, খাবারগুলো ফেলে দিয়ে আবার নতুন ক'রে তৈরী করি গে। ও পান্তাভাত খেতে পারবেন কেন?

না, আজ সত্যি বকব। কেন উনি এত দেরী করবেন? আমি কি কেউ নই? সমস্ত দিন পরে বাড়ী আসবেন, তাও দু'ঘণ্টা দেরী করে? কেন, বাড়ীতে বাঘ আছে না ভাল্লুক আছে? দিনান্তেও দেখতে ইচ্ছে করে না? আমার ত—, না পুরুষমানুষের সে সব বালাই নেই। সে শুধু এই পোড়া মেয়েমানুষের।

এই পাঁচ বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, এক দিনের জন্যে কখনও বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছেও হয়নি। আর উনি? বোধ হয় আমি বাপের বাড়ী গেলেই খুসী হন। বেশ, তাই যাব। আমাকে যখন ভালই লাগে না তখন থেকেই কি আর না থেকেই কি?

ঐ যে আসা হচ্ছে! মুখ হাসি হাসি। তা ত হবেই—কত ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আসা হ'ল—মুখ হাসি হাসি হবে না? আমাকে দেখলেই আবার মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে।

না, মনের ভাব প্রকাশ করব না, প্রকাশ করেই বা লাভ কি? আমার রাগঅভিমান কে গ্রাহ্য করে? তার চেয়ে একখানা বই নিয়ে বসি—যেন কিছুই হয়নি।

উনি এসে বাড়ী ঢুকলেন। মুখে অনুতাপ বা লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই, যেন দেরী ক'রে এসে ভারী বাহাদুরী করেছেন। ঘড়ির দিকে

তাকিয়ে দেখলুম, সওয়া ছ'টা। বই মুড়ে রেখে খুব ঠাণ্ডা ভাবেই জিজ্ঞাসা করলুম—"এলে ?"

অমনি মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, যেন কে সুইচ্ টিপে বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে দিলে।

কি বলেছি আমি? 'এলে' বলাতেই এত দোষ হ'ল? তা ছাড়া আর কি বলতুম? যদি বলতুম, 'এত দেরী ক'রে এলে কেন, তা হলেই কি ভাল হ'ত? তা নয়—আমাকে দেখেই মুখ অমন হয়ে গেল। আমি বাড়ীতে না থাকলেই বোধ হয় খুসী হ'তেন।

কিন্তু তাই ব'লে আমি ত চুপ ক'রে থাকতে পারি না। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে খাবার আনতে গেলুম। খাবার ত যা হবার তাই হয়ে আছে, চায়ের জলও উনুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আমার যেমন কপাল, তেমনই ত হবে।

তাই এনে মুখের সামনে ধ'রে দিলুম। চোখ ফেটে জল আসতে লাগল। কি করব? এখন ত আর নতুন তৈরী ক'রে দেবারও সময় নেই। খাবার মুখে দিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন। আমি কি করব—ওগো, আমি কি করব? কেন তুমি এত দেরী ক'রে এলে? আমারই খালি দোষ?

আচ্ছা, আমারি দোষ, ঘাট হয়েছে। কিন্তু বক্‌ছ না কেন? অমন মুখ বুজে শাস্তি দেবার কি দরকার?

যাক, তবু চা'টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। এবার অন্য কথা বলি, তবু যদি মনটা অন্য দিকে যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ তোমার মাইনে পাবার দিন না?"

কথার জবাব দিলেন না, উঠে গিয়ে পকেট থেকে টাকা বার করে হাতে দেওয়া হ'ল। যেন টাকার জন্যেই আমি ম'রে যাচ্ছিলুম, আমি খালি টাকাই চিনি। এত অপমান করা! টাকাগুলো

জানালা গলিয়ে দূর ক'রে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। উঃ—আমার মরণও হয় না!

টাকা গুণে দেখলুম—পনেরো টাকা কম। এই এক ঘণ্টার মধ্যে পনেরো টাকা কি করলেন? হাতে টাকা এলে আর রক্ষে নেই, অমনি নয়-ছয় করবেন। না বাপু, আমি আর পারি না। হয় ত কতকগুলো বই কিনে বসে আছেন কিম্বা কোনও বন্ধুকে ধার দেওয়া হয়েছে! বন্ধুকে ধার দেওয়া মানেই—

বললুম,—"পনেরো টাকা কম যে?"

উত্তর হ'ল,—"খরচ করেছি!"

আমি যেন তা জানি না। খরচ না করলে টাকাগুলো কি পকেট থেকে ডানা মেলে উড়ে যাবে? মানে, কিসে খরচ করেছেন তা বলা হবে না।—সত্যিই ত, আমাকে বলতে যাবেন কেন? ওঁর নিজের টাকা নিজে খরচ করেছেন—আমাকে তার হিসেব দিলে যে অপমান হবে। আমি ত ওঁর কেউ নই—জানবার অধিকারও নেই?

যাই, টাকাগুলো ওপরে বন্ধ করে রেখে আসি, নইলে এখনই হয় ত মনে করবেন—কি মনে করবেন উনিই জানেন। মনের মধ্যে গিঁট দেওয়া স্বভাব ত।

ফিরে এসে বসলুম। তবু মুখে কথা নেই। আচ্ছা, চুপ করে দু'জন মুখোমুখি কতক্ষণ ব'সে থাকা যায়? আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন বল্‌লেই ত পারেন। আর, কথা কইতে ইচ্ছে না হয়, তাও খুলে বললেই হয়। না বাপু, মিছিমিছি অমন মুখ ভার ক'রে থাকা আমার ভাল লাগে না।

খবরের কাগজটা টেবলের ওপর রাখা রয়েছে—বোধ হয় ঐটে পড়বার জন্যেই মন ছট্‌ফট্ করছে। তা পড়লেই ত পারেন। হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকবারই বা কি দরকার?

বললুম,—"খবরের কাগজ পড়বে?"

মুখখানা আরও অন্ধকার হয়ে উঠ্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে উঠে পড়লেন—কাপড়-জামা পরতে লাগলেন। তার পর মুখ কালো ক'রে বললেন,—"বেড়াতে যাচ্ছি।"

আবার কি অপরাধ করলুম ?

বেশ, বেড়াতে যাচ্ছেন যান—আমার সঙ্গে এক মিনিটও ভাল লাগে না, সে ত আমি জানি—কিন্তু এ দিকে যে বামুন ঠাকুরটা দুপুর থেকে জ্বরে পড়েছে, কখন্ উনি এসে একফোঁটা ওষুধ দেবেন, এই পিত্যেশ ক'রে রয়েছে। আর উনি ওষুধ না দিলে এ বাড়ীর কারুর সারেও না অসুখ। এখন কি করি ? উনি ত আড্ডায় চললেন,—সেই সাড়ে ন'টার সময় ফেরা হবে। ততক্ষণ বামুনটা এক ফোঁটা ওষুধ পাবে না ?

ভয়ে ভয়ে বললুম,—"বামুন ঠাকুরের আজ দুপুর থেকে জ্বর—"

'বুঝেছি' ব'লে বেরিয়ে গেলেন।

বুঝেছি মানে কি ? বামুন ঠাকুরের জ্বর হয়েছে, এতে বোঝাবুঝির কি আছে ? সব কথাই যেন হেঁয়ালি। পাঁচ বছর ঘর করছি—বয়সও কম হ'ল না কিন্তু তবু মনের অন্ত পেলুম না। না—আমার আর ভাল লাগে না, ইচ্ছে করে, কোথাও চ'লে যাই।

কিন্তু যাবার কি উপায় আছে ? চিরদিন ঘরে বন্ধ থাকবার জন্যে জন্মেছি, শেষ পর্য্যন্ত ঘরেই বন্ধ থাকব। বাইরের সমস্ত পৃথিবী ওঁদের, ঘরটি খালি আমাদের ! তা আমি ত ঘরের বার হ'তে চাই না, কিন্তু উনি কেন একদণ্ড ঘরে থাকবেন না ? উনি থাকলে ত আমার আর কিছু দরকার হয় না !

বেশ, যেখানে ইচ্ছে থাকুন, যেখানে ভাল লাগে থাকুন। আমি একলাটি মন গুমরে থাকলে ওঁর কি ? পুরুষমানুষ যে—পাথর দিয়ে তৈরী।

না, আর ভাবব না। যাই কাপড় ছেড়ে রান্না চড়াই গে। আচ্ছা, সারাদিন একলাটি থাকি—একটু দয়াও হয় না?

সেই ন'টা বাজল, তবে ফিরলেন। এক মিনিট আগে হবার যো নেই। সেখানে যে প্রাণের বন্ধুরা আছেন!

এসেই খেতে বসলেন—কথাবার্ত্তা কিছু নেই। তবু দেখতে পাই, বাইরে থেকে ফিরলেই মুখখানা প্রফুল্ল হয়। হবেই ত। বাইরে কত মজা—কত বন্ধু, হবে না? আমার সঙ্গে হেসে কথা কইতেই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। বেশ, আমিও কথা কইব না, শুনতে যখন ভালবাসেন না, তখন কাজ কি!

পান নিতে নিতে প্রথম কথা কইলেন। বললেন—"উঃ! আজ কি গরম! রাত্রে ঘুম হ'লে হয়।"

এ কথার মানে আমি আর বুঝতে পারি না? গরম এমন কিছু নয়—আমি পাশে শুই বলেই ঘুম হয় না! বেশ, তাই সই। আমি না হয় আলাদাই শোব—তাতে কি? এক বিছানায় শুতে যখন কষ্ট হয়, তখন আমি মেঝেতেই শোব।

বললুম—"বেশ আমি না হয় মেঝেয় মাদুর পেতে শোব।"

না, তাও হবে না। আমার সঙ্গে এক ঘরে শুতেও কষ্ট হবে। বললেন,—"আমিই নীচে তক্তপোশে শোব। তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

নিজে বিছানা পেতে শোয়া হ'ল। বেশ! বেশ!

আমার চোখের জল না দেখলে ওঁর যে প্রাণে শান্তি হয় না। একলা ঘরময় ঘুরে বেড়াই—আর কি করব! ঘুম ত কিছুতেই চোখে আসবে না।

শোব? উনি নীচে তক্তপোশে প'ড়ে রইলেন...আর আমি—এগারটা বাজল; এতক্ষণে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারা দিন খেটে—

না, আমি পারব না—পারব না। কেন আমি দূরে দূরে থাকব?

এই পাঁচ বছরের মধ্যে এক দিনও আলাদা শুয়েছি?…যাই, দেখি—

ঘুমিয়ে পড়েছেন। তক্তপোশের বিছানা—একটা তোষকও নেই, শুধু সতরঞ্চি আর চাদর। শক্ত কাঠ গায়ে ফুটছে, তবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আচ্ছা, এ কেন? আমার ওপর রাগ ক'রে নিজেকে শাস্তি দেওয়া—কি জন্যে?

পাশে শুতেই "অ্যাঁ, কে?"—ব'লে চমকে উঠলেন। তারপর তন্দ্রার ঘোরেই জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "মিনা।"

এই ত রাগের বহর—ঘুমুলেই ভুলে যান! আমি বললুম,—"চল, ঘরে শোবে চল।"

এইবার ভাল ক'রে ঘুম ভাঙ্গল, বললেন,—"না, আজ এইখানেই শুই এস। আর ওপরে উঠতে পারি না।"

সেই ভাল।

কিন্তু একটি বৈ মাথার বালিস যে নেই? তা—

আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না।

বহুরূপী

এটা বরদার গল্প হইলে কখনই বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্যাপারটা আমার চোখের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল, সুতরাং হাসিয়া উড়াইয়া দিবার আর পথ নাই। যদিও বরদা মূলতঃ এই ঘটনার সহিত ঘনিষ্টভাবেই জড়িত ছিল, তবু এত বড় ভোজবাজী তাহার মত মিথ্যাবাদীর পক্ষেও অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

গত শীতকালে বরদার মস্তকে হঠাৎ বিষয় বুদ্ধি চাগাড় দিয়া উঠিয়াছিল। সহর হইতে মাইল পনের দূরে—বেহারের গ্রাম্য

ভাষায় যাহাকে দেহাত বলে—সেই অজ পাড়াগাঁয়ে বরদার কিছু ধান জমি ও কয়েক ঘর কায়েমী প্রজা ছিল। এতকাল ফৌজদার সিং নামক জনৈক শিশোদীয় বংশীয় রাজপুত এই সকল বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ বরদা শিশোদীয় রাজপুতের সততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া স্বয়ং দুর্জ্জয় শীতে ধান কাটাইবার জন্য প্রস্থান করিল। দশদিনের মধ্যে তাহার আর কোন খবরই পাওয়া গেল না।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ক্লাবে বসিয়া অনর্গল মিথ্যা কথা না বলিলে যাহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়, সঙ্গীহীন পাড়াগাঁয়ে তাহার এই দীর্ঘ প্রবাস কি করিয়া কাটিতেছে, এই প্রশ্ন আমাদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। সেখানে বরদা কাহাকে আষাঢ়ে গল্প শুনাইতেছে ? আমরা ভাবিয়াছিলাম, দুদিন যাইতে না যাইতেই সে পলাইয়া আসিবে—কিন্তু এ কি ! দশ দিন কাটিয়া গেল এখনও তাহার দেখা নাই। তাহার বাড়ীতে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বরদা নিজের কাছারী বাড়ীতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, শীঘ্র গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা নাই ; ধান কাটানো যে কিরূপ আনন্দদায়ক কার্য্য তাহাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া লম্বা চিঠি লিখিয়াছে। শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

অমূল্য বলিল—'ধান-টান সব মিছে কথা, যা হয়েছে আমি বুঝেছি। বরদার বৌ ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বঙ্গ মহিলা হলেও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে ত !'

তা সে কারণ যাহাই হোক্, বরদার অভাবে ক্লাবের সান্ধ্য অধিবেশনগুলি নিঝুম ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িতে লাগিল। বরদা যতই মিছে কথা বলুক, সে একজন সত্যকার মজলিশি লোক তাহা ক্রমশ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম ; এমন কি অমূল্যকে দেখিয়াও মনে হইতে লাগিল, তর্ক করিবার একজন প্রতিপক্ষের অভাবে সে ভিতরে ভিতরে বিশেষ মুষড়িয়া পড়িয়াছে।

অবশেষে চৌদ্দ দিনের দিন বরদার চিঠি আসিল; তাহার বাড়ীর চাকর রঘুয়া সন্ধ্যাবেলা চিঠিখানা ক্লাবে দিয়া গেল। ক্লাবের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বরদা চিঠি দিয়াছে; পাঠ করিয়া তাহার দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের যথার্থ কারণ অজ্ঞাত রহিল না। বরদা লিখিয়াছে—

বন্ধুগণ, তোমরা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করনা; আমি কাল্পনিক ভূতের গল্প বানাইয়া বলি এরূপ ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে করিয়া থাক। তোমাদের মত অন্ধ নাস্তিকের বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিজের চোখে ভূত দেখিতে চাও? স্বকর্ণে ভূতের কথা শুনিতে চাও? ভূতের সহিত করকম্পন করিতে চাও?

আমি এখানে আসিবার পর আমার কাছারী বাড়ীতে একটি অশরীরী আত্মার সহিত পরিচয় হইয়াছে। অত্যন্ত মিশুক লোক, প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের গল্প-গুজব আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি তোমাদের সহিত আলাপ করিতে রাজী হইয়াছেন। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, সকলে মিলিয়া এখানে চলিয়া এস। এক রাত্রি থাকিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

কবে আসিতেছ জানাইও। এখানে আসিতে হইলে তারাপুর পর্য্যন্ত বাসে আসিতে হয়, সেখান হইতে আমার আস্তানা পদব্রজে আড়াই মাইল। রাস্তাঘাট নাই বটে, কিন্তু এসময়ে কোনও কষ্ট হইবে না। তারাপুর থানায় খোঁজ লইলে সেখানকার চৌকিদার পথ দেখাইয়া দিবে। ইতি

তোমাদের বরদা

চিঠি পড়িয়া অমূল্য বলিল, 'হুঁ, এই চৌদ্দ দিন জিরিয়ে নিয়েছে কিনা, একটা বড় রকম বুজরুকি দেখাবে।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু ভূতের সঙ্গে করকম্পনটা হবে কি করে?'

পৃথ্বী বলিল,—'সেটা যথাস্থানে পৌঁছে পরীক্ষা করে দেখা যাবে। তা হলে কবে যাওয়া স্থির করছ?'

গবেষণার পর স্থির হইল আগামী মঙ্গলবার আমি, অমূল্য, পৃথ্বী ও চুনী এই চার জন, পূর্ব্বাহ্নে কোনও খবর না দিয়াই বরদার আড্ডায় গিয়া হানা দিব। বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে, প্রেতাত্মার সহিত করকম্পনের মহাসৌভাগ্য যদি নাও ঘটে তবু একটা আউটিং ত হইবে। ওদিকটাতে শিকারও ভাল পাওয়া যায়।

*

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা চারিজন বৈকালে আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় বাস হইতে অবতরণ করিয়া হাঁটা পথ ধরিলাম। ধান ক্ষেতের আলের উপর দিয়া যাহাদের চলা অভ্যাস নাই তাহাদের পক্ষে এই পথে পদক্ষেপ সর্ব্বদা নিরুদ্বেগ নয়,—মাঝে মাঝে অতর্কিতভাবে পথিপার্শ্বস্থ পঙ্কশয্যায় বিশ্রাম করিবার সুযোগ ঘটিয়া যায়। কিন্তু সে যাহাই হোক আড়াই মাইল পথ যে এত দীর্ঘ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবিতে পারি নাই! অমূল্য শ্লেষ করিয়া বলিল, মাইলগুলা সম্ভবত ভৌতিক মাইল, তাই তাহাদের আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এই অতি-প্রাকৃত আড়াই মাইলের শেষে যখন বরদার আস্তানায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন পৃথিবীপৃষ্ঠে দিনের আলো আর নাই, কেবল পশ্চিম আকাশে শীর্ণ সন্ধ্যালোক মুমূর্ষুর প্রাণশক্তির মত নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে।

চারিদিকে কোথাও মানুষের বসতি নাই, আবছায়া ধানক্ষেতের মাঝখানে বিঘাখানেক পতিত জমি, তাহারই একপ্রান্তে একটি জীর্ণ ইটের ঘর—চারিপাশে অপরিসর একটু বারান্দা, মাথার উপর খড়ের ছাউনি। পতিত জমির উপর স্থানে স্থানে খড়ের স্তূপ রাখা আছে। প্রথমটা লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ঠিক স্থানে পৌঁছিয়াছি কি না-সন্দেহ হইতে লাগিল। অনতিদূরে একটা শিকলে বাঁধা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল, কাছে গিয়া দেখিলাম

বরদার কুকুর—খোকস। খোকসের সহিত আমাদের প্রণয় ছিল, কিন্তু সে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিল না, নিদ্রালুভাবে একবার তাকাইয়া আবার থাবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

কিন্তু বরদা কোথায়? ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে না; এদিক ওদিক চাহিতে দেখি খড়ের একটি গাদার তলা হইতে হামাগুঁড়ি দিয়া একটি প্রাণী বাহির হইয়া আসিতেছে। মূর্ত্তিটি ক্রমে খাড়া হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া ফৌজী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম বুঝি বরদার শিশোদীয় বংশীয় রাজপুত; কিন্তু দেখিলাম—তাহা নয়, নেপাল হইতে অবতীর্ণ চন্দ্রবংশীয় একজন ক্ষত্রিয়। সম্ভবত বরদার দেউড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিধানে খাকি পোষাক, পায়ে বুট জুতা, কোমরে কুক্‌রি—রীতিমত যোদ্ধবেশ। তাঁহাকে বরদার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি চন্দ্রবংশীয় ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

শীতে এতখানি পথ হাঁটিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নির্ব্বিকার মুখে আবার খড়ের গাদার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা যেখানে ছিলাম সেখান হইতে ঘরটি বোধ করি ত্রিশ কদম দূরে। বারান্দা সুদ্ধ ঘরের ভিত মাটি হইতে হাত দুই উঁচুতে অবস্থিত। বারান্দায় উঠিয়া সম্মুখেই ঘরের দ্বার; আমি সর্ব্বপ্রথম উপরে উঠিয়া দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়াই চমকাইয়া উঠিলাম!—অন্ধকার দরজার মুখে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পরক্ষণেই বরদা সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল—'এস। খবর না দিয়ে এলে যে; আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না?'

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। বরদা একটা তেলের ল্যাম্প জ্বালিয়া টেবলের উপর রাখিল।

অমূল্য ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল,—'ঘরেই ছিলে ত—সাড়া দিচ্ছিলে না কেন?—দেয়ালা হচ্ছিল বুঝি?'

উত্তরে বরদা কেবল হাসিল। বলিল,—'বস সবাই। শীতে নিশ্চয় কালিয়ে গিয়েছ। চা তৈরী আছে—দিচ্ছি।' বলিয়া প্রকাণ্ড একটা থার্ম্মোফ্লাস্ক হইতে ধূমায়িত চা ঢালিয়া সকলকে দিতে লাগিল।

চা খাইতে খাইতে বরদার ঘরের চতুর্দ্দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরের কোথাও এতটুকু প্ল্যাষ্টার নাই, নোনাধরা লাল ইটগুলি সারি সারি দাঁত বাহির করিয়া আছে; মেঝে মাটির, গোময় দিয়া লিপ্ত। এক কোণে একটি ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর বরদার লেপ-বিছানা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। আর এককোণে একটি বড় কাঠের সিন্দুক, তাহার উপর চায়ের সরঞ্জাম ষ্টোভ ইত্যাদি রাখা আছে; ঘরের মধ্যস্থলে একটি কেরোসিনকাঠের টেবল, এবং তাহাই ঘিরিয়া কয়েকটি কঞ্চির মোড়ার উপর বসিয়া অনুজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় আমরা কয়জন চা পান করিতেছি।

খোলা দরজা দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল, বরদা সেটা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিল; তৃপ্তভাবে দুই হাত ঘসিতে ঘসিতে বলিল, 'আমার ঘরটি কেমন দেখছ? ঘর ছিল না, কেবল চারিটি পুরাণো দেওয়াল দাঁড়িয়ে ছিল; আমি এসে খড়ের চাল তুলে বাসের উপযোগী করে নিয়েছি।—বেশ হয় নি?'

'খাসা হয়েছে!'

'পেয়াদা সেপাই চিরকাল বাইরে খড়ের ছাপ্পর তৈরি করে তার মধ্যে থাকে; এবারও তাই আছে। কিন্তু আমি ভাই পারলুম না। তেরপলের তলায় এক রাত্তির শুয়েছিলুম—বাপ কি শীত! ঘরের মধ্যে এক রকম ভালই আছি। আচ্ছা, ঘরটা তোমাদের বেশ ইয়ে বোধ হচ্ছে না?'

আমরা সকলেই ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম। 'ইয়ে' বলিয়া

বরদা ঠিক কি বুঝাইতে চাহিল জানি না, কিন্তু এই ঘরে পদার্পণ করিবার পর হইতেই আমার মনের উপর কেমন একটা ছায়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, মনের সে পরিহাস-তরল ভাব আর ছিল না। কোথায় এ ঘরের কি গলদ আছে—বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অথচ অপরিচিত অন্ধকার পথে চলিবার সময় যেমন চক্ষু-কর্ণের তীক্ষ্ণতা অজ্ঞাতসারেই বাড়িয়া যায়, তেমনি একটা দুর্লক্ষ্য অবাস্তবতার সংশয় আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিশয় সতর্ক ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল।

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া অমূল্য বলিল,—'তারপর, তোমার ভূত কৈ ?'

বরদার হাসিমুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইয়া গেল। সে যেন কয়েক মুহূর্ত্ত উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিল, তারপর অমূল্যর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—'ভয় নেই, তাঁর পরিচয় পাবে; মিছে তোমাদের এত দূর ডেকে আনি নি।'

চুনী জিজ্ঞাসা করিল,—'কতক্ষণে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে? তাঁর আসার সময়ের কিছু স্থিরতা আছে কি ?'

বরদা বলিল,—'কিছু না। শুধু তাই নয়, কোন রূপে তিনি আসবেন, তারও স্থিরতা নেই।'

আমরা মোড়া টানিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিলাম। পৃথ্বী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'সেটা কি রকম!'

বরদা বলিল,—'তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে আসেন বটে, কিন্তু চেহারা সব সময়ে এক রকম হয় না।"

'তার মানে কি ?'

'তার মানে—' বরদা যেন একটু ইতস্তত করিল—'অশরীরী আত্মাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে হলে কিছু জান্তব মাল মশ্‌লার দরকার হয়, তার নাম বিজ্ঞানের ভাষায় এক্‌টোপ্লাজ্‌ম্। এই এক্‌টো-প্লাজ্‌ম্ প্রয়োজন মত না পেলে চেহারা একটু অন্যরকম হ'য়ে যায়।'

অমূল্য বলিল,—'ও, তোমার সেই পুরাতন থিওরি! কিন্তু তোমার ইনি এক্‌টোপ্লাজম্ পান কোথা থেকে।'

বরদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল,—'বোধ হয় খোক্কসের গা থেকে। তিনি যতক্ষণ থাকেন, কুকুরটা নির্জ্জীব হয়ে পড়ে থাকে,— নড়েচড়ে না, ডাকেও না—তবে শুধু যে এক্‌টোপ্লাজমের তারতম্যে চেহারার তারতম্য হয় তা নয়, অন্য কারণও আছে।'

'অন্য কারণটি কি ?'

'ইচ্ছা। প্রেতযোনী ইচ্ছা করলেই চেহারা বদল করতে পারে; কারণ, তাদের দেহের উপাদান মানুষের দেহের উপাদানের মত কঠিন বস্তু নয়।'

এই সময়ে বরদাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। এ কয়দিনে তাহার কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরোক্ষ বিশ্বাসের গণ্ডী ছাড়াইয়া যেন সে সাক্ষাৎ উপলব্ধির দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার্কিকের যুযুৎসা একেবারেই নাই, মুখে একটা নিঃসংশয় প্রসন্নতার ভাব, ঠোঁটের কোণে একটু সকৌতুক কোমলতা ক্রীড়া করিতেছে। বরদার এই অবস্থান্তর আমার মনের ছায়াকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিল।

পৃথ্বী বলিল,—'থিওরী যাক। এখন ঘটনাগুলো বল শুনি।—তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কতদূর দাঁড়িয়েছে, কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হল ইত্যাদি। অর্থাৎ তোমাকে আগাগোড়া গল্পটা বলবার সুযোগ দিচ্ছি। আরম্ভ কর।'

বরদা একটু হাসিয়া বলিল,—'বেশ।' তার পর আবার যেন কান পাতিয়া কি শুনিল,—'দ্যাখো একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। যদি কোনো সময় বুঝতে পারো যে তিনি এসেছেন—ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

চারিদিকে সচকিতভাবে একবার চাহিয়া আমরা আশ্বাস দিলাম, ভয় পাইব না। বরদা তখন বলিতে আরম্ভ করিল—

'প্রথম যে রাত্রে এ ঘরে শুই, সে রাত্রে কিছু বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয় রাত্রে হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল; শুনতে পেলুম, ঘরের মধ্যে কে খস্ খস্ করে চলে বেড়াচ্ছে। দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলুম, ভাবলুম, সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে। বালিশের তলায় টর্চ ছিল, হঠাৎ জ্বেলে ঘরের চারিদিকে ফেললুম। কেউ কোথাও নেই।

'আবার আলো নিভিয়ে যেই শুয়েছি অমনি খস্‌খস্ শব্দ আরম্ভ হল। আবার আলো জ্বাললুম। এই রকম তিন চার বার হল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলুম। চিরজীবন এই বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, তবু বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। আলো নিভিয়ে গলার স্বর যথাসাধ্য সংযত করে বললুম—'আপনি কে আমি জানি না; কিন্তু আপনার যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলতে পারেন।'

'মনে হল, কে যেন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলুম, "আপনি ভয় পাবেন না।"

'লেপের মধ্যে থেকেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, বললুম—'না।'

'তিনি মৃদু কণ্ঠে একটু হাসলেন! যেন আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। হাসি শুনে আমার মনে সাহস হল; ভারি সহানুভূতি-পূর্ণ নরম হাসি—একটু করুণ। আমি বললুম,—'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

'চোখে কিছুই দেখতে পেলুম না, অনুভবে বুঝলুম, তিনি আমার বিছানার পাশে বসলেন। তারপর নিঃশ্বাসের মত মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি এই ঘরটাতে থাকি। আপনি এসে পর্য্যন্ত আলাপ করবার জন্য ছটফট করছি, কিন্তু পাছে আপনি ভয় পান—তাই সাহস হচ্ছিল না।'

'আমি কি বলব ভেবে পেলুম না। তিনি বলতে লাগলেন,—'এইখানে প্রায় পঁচিশ বছর আছি। ঘরটা আমিই তৈরী করিয়েছিলুম, তারপর মৃত্যুও হল এইখানেই। প্লেগ হয়েছিল···সৎকার করবার

লোক ছিল না, মৃতদেহটাকে শেয়াল-কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করলে···সেই থেকে এ জায়গা ছেড়ে যাবার আমার উপায় নাই···একলাই থাকি। আপনি এসেছেন দেখে ভারি আনন্দ হল; কারুর সঙ্গে ত মিশতে পারি না;—দুটো কথা কইবারও সুযোগ হয় না। সবাই ভয় পায়; অথচ আমি—আমরা কারো অনিষ্ট করতে চাই না—ক্ষমতাও নেই। —কেন বলুন দেখি সবাই ভয় পায়?'

'এ প্রশ্নের উত্তর জানি না, তাই জবাব দেওয়া হল না। তিনি বললেন, 'আমি যদি মাঝে মাঝে এসে আপনার সঙ্গে গল্প-সল্প করি, আপনার কষ্ট হবে না ত?'

আমি বললুম—'না, বরং খুসী হব।'

'তিনি গাঢ় স্বরে বললেন,—'ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাকে চোখে দেখলে কি আপনি খুব ভয় পাবেন? সত্যি বলছি আমার চেহারা বীভৎস নয়—সাধারণ মানুষের মত।'

বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠল, কিন্তু বললুম,—'না, ভয় পাব না।'

'তবে আলোটা জ্বালুন।'

'মনকে দৃঢ় করে টর্চ্চ জ্বাললুম। মুহূর্ত্তের জন্য তাকে দেখতে পাওয়া গেল। আমাদেরই সমবয়স্ক একটি যুবক, ময়লা রং, বড় বড় চুল—আগ্রহভরা চোখে আমার পানে চেয়ে রয়েছেন। নিতান্তই সহজ মানুষের চেহারা, ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু তবু বুদ্ধি-বিবেচনা কোনও কাজেই লাগল না, সমস্ত অন্তরাত্মা যেন ভয়ে আঁৎকে উঠল। মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। শুনতে পেলুম, বাইরে খোক্কস কুকুরটা কান্নার মত একটা দীর্ঘ আওয়াজ করে ডেকে উঠল।'

বরদা চুপ করিল।

ফুসফুস হইতে অবরুদ্ধ বাষ্প মুক্ত করিয়া বলিলাম,—'তারপর?'

বরদা বলিল,—'তারপর—' সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্ব্বের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি

বলিল, 'সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে—হ্যাঁ, তারপর ক্রমে ভয় কেটে গেল। এখন রোজই তিনি আসেন, অনেক কথাবার্ত্তা হয়। তোমাদের সঙ্গেও দেখা করবার জন্যে তিনি খুব উৎসুক ছিলেন—কিন্তু—। আর সময় নেই—এস।' বরদা আমার দিকে প্রসারিত করতল বাড়াইয়া দিল। কিছু না বুঝিয়া তাহার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিলাম। বরদার হঠাৎ হইল কি? আমাদের বিদায় করিতে চায় নাকি?

অমূল্য বলিল,—'কিন্তু কৈ তিনি এখনও দেখা দিলেন না?'

বরদা আবার বসিয়া পড়িল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল,—'হয়ত দেখা দিয়েছেন—তোমরা জানতে পারনি—'

এই সময় বাহিরে দ্রুত পদধ্বনি শুনা গেল। আমরা চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। পদশব্দ বারান্দার উপরে উঠিল, তারপর বন্ধ দরজায় সজোরে ধাক্কা পড়িল। হৃদযন্ত্রটাও ওই ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিল; আমরা প্রশ্ন-বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম—এ সময় হঠাৎ কে আসিল? তবে কি—

বরদার মুখে একটা ম্লান হাসি ক্রীড়া করিতেছিল; সে পূর্ণ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিল,—'বুঝতে পারছ না?'

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম।

বরদা ব্যথিত অবসন্ন কণ্ঠে বলিল,—'এখনি বুঝতে পারবে; দোর খুলে দাও—'

দ্বার খুলিয়া দিব? কিন্তু দ্বারের ওপারে কী আছে?

আবার সজোরে ধাক্কা পড়িল; বরদা আবার চোখের নীরব ইঙ্গিতে আমাকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। আমি মোহাচ্ছন্নের মত উঠিয়া গিয়া দ্বারের হুড়কা খুলিয়া দিলাম।

অধীর হস্তে কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল—বরদা!

বরদা বলিয়া উঠিল,—'আরে, তোমরা এসেছ? আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলুম—' আমাদের মুখ দেখিয়া বরদা অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল।

আমরা সকলে, যে মোড়ায় বরদা বসিয়াছিল সেই দিকে ফিরিয়াছিলাম। দেখিলাম, মোড়ায় যে বসিয়াছিল সে নাই—মোড়া খালি।

এই সময় বাহিরে বরদার কুকুরটা কান্নার মত একটা দীর্ঘ একটানা সুরে ডাকিয়া উঠিল।

বরদা সেই ডাক শুনিয়া তীক্ষ্ণ চক্ষে আমাদের পানে চাহিল, তারপর ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল,—'অ্যাঁ! তবে কি—?'

আমি অতি কষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিলাম,—'হ্যাঁ। অতিথি সৎকারের কোনও ত্রুটি হয় নি। কিন্তু ভাই, আজ রাত্রেই আমরা বাড়ী ফিরব।'

হাসি-কান্না

অধরোষ্ঠ প্রসারিত করিয়া দন্ত নিষ্কাশনপূর্ব্বক সশব্দে অথবা নিঃশব্দে মুখের একপ্রকার ভঙ্গী করার নাম হাসি। আবার, ঠিক উক্তপ্রকারে অধরোষ্ঠ প্রসারণ ও দন্ত বিকাশ করিয়া প্রায় অনুরূপ মুখভঙ্গী করিলে উহা কান্না নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উভয়বিধ অভিব্যক্তির মধ্যে সীমা-রেখা অতিশয় সূক্ষ্ম। তবে মৎসদৃশ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সহজেই উহাদের পার্থক্য ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

অপিচ, হাসির সহিত আনন্দ নামক মনোভাবের একটা নিত্য-সম্বন্ধ আছে এইরূপ অনেকে মনে করেন, এবং কান্নার সহিত তদ্বিপরীত। এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি একটি মহিলাকে জানিতাম, মনে কোনপ্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইলেই তিনি হাসিতেন; এমন কি মৃত্যুকালেও তিনি হাসিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাক।

আজ রুচিরার হাসি-কান্নার কাহিনী বলিব। রুচিরা মেয়েটি সামান্য নয়। তাহার বয়স উনিশ বছর, কলেজের বি এ ক্লাসের ছাত্রী এবং—কিন্তু সে কালো। তাহাকে কালো বলিলেই সে হাসিত।

কালো মেয়ে বাঙলাদেশে অনেক আছে, সেজন্য ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দৈব-পরিহাস এই যে, রুচিরার খুড়তুত বোন ছন্দা অপূর্ব্ব সুন্দরী, ডানাকাটা পরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুজনে সমবয়স্কা, একসঙ্গে পড়ে, এক বাড়ীতে থাকে, দুজনেরই পিতা বর্ত্তমান এবং একান্নবর্ত্তী। ইহাতেও বোধ করি ক্ষতি ছিল না, কিন্তু একটি আগন্তুক কোথা হইতে আসিয়া রুচিরার হাসি-কান্নার সহিত মিশিয়া গিয়া ব্যাপারটা যৎপরোনাস্তি জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

এই আগন্তুকের কথা আনুপূর্ব্বিক বলা প্রয়োজন। একদিন সন্ধ্যাকালে ছন্দা ও রুচিরা কোন একটি কৃত্রিম হ্রদের উপকণ্ঠে বসিয়া নিজেদের পড়াশুনার অসম্পূর্ণতার কথা লইয়া তর্ক করিতেছিল। বাৎসরিক পরীক্ষা সমাগতপ্রায়, অথচ দুজনেরই এমন অ-প্রস্তুত অবস্থা যে, পরীক্ষায় প্রকাশ্যভাবে অপ্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে একজন গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য যে একান্ত প্রয়োজন, ইহাই দুই বোনে একমত হইয়া তর্ক করিতেছিল। মেয়েদের তর্ক করিবার ইহাই রীতি, তাহারা একমত হইলেও তর্ক শেষ হয় না।

ছন্দা বলিল, 'ইংরেজী আর বাংলা কোনও রকমে চালিয়ে নেব, কিন্তু আমার মাথা খাবে—সংস্কৃত। মৃচ্ছকটিক পড়েছিস ? কিছু বুঝতে পারিস ?'

রুচিরা আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল,—'আমার মাথা খাবে —ফিলজফি। ভোলিশান আর রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শনের তফাৎ বুঝতে পারিস ?'

ছন্দা বলিল,—'কিচ্ছু না ; ঝাড়া মুখস্থ করেছি।—কিন্তু সংস্কৃত যে ছাই মুখস্থও হয় না।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রুচিরা বলিল,—'মাষ্টার! একটা মনের মতন মাষ্টার না হলে দুজনেই গেলুম—'

তাহাদের পিছনে রাস্তার পাশে মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। মোটরে তাহারা বায়ু্ সেবন করিতে আসিয়াছে, মোটরেই ফিরিবে। রুচিরা উঠিবার উপক্রম করিল।

ছন্দা তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'কিন্তু এমন মনের মতন মাষ্টার পাবি কোথায়?'

রুচিরা মাথা নাড়িল,—'নেই। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করবে না, তোর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে না—কেবল সংস্কৃত আর ফিলজফি পড়াবে—এমন মাষ্টার ভূ-ভারতে নেই। চল বাড়ী যাই।'

দু'জনে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বসিয়া পড়িল।

অনতিদূরে আর একটা বেঞ্চির উপর যে একজন লোক বসিয়া আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহই লক্ষ্য করে নাই। এখন লোকটি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া একবার করযুগল যুক্ত করিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীর স্বরে বলিল,—'মাফ করবেন, আপনারা কি মাষ্টার রাখতে চান?'

ছন্দা ও রুচিরা নির্ব্বাক হইয়া লোকটির পানে তাকাইয়া রহিল। টুইলের হাফ-সার্ট পরা যুবক, মাথার চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য্য, অধরোষ্ঠে একটু ছেলেমানুষী ভাব।

কিছুক্ষণ দম লইয়া রুচিরা ক্ষীণস্বরে প্রশ্নের উত্তর দিল; বলিল,—'হ্যাঁ।'

যুবক বলিল,—'তাহলে যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনাদের পড়াতে পারি। মৃচ্ছকটিক একটি বস্তুতান্ত্রিক নাটক; ইব্‌সেন অমন নাটক লিখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আর, ভোলিশান এবং রিফ্লেকস্ অ্যাক্‌শনের তফাৎ আমি এক মিনিটে বুঝিয়ে দিতে পারি।'

ছন্দা আচ্ছন্নের মত বলিল,—'আপনি—আপনি কে?'

যুবক বলিল,—'আমার নাম সরিৎ হালদার। আমি একজন বেকার যুবক; অর্থাৎ কোনও কাজই করি না। তবে, সুযোগ পেলে কাজ করতে রাজি আছি।'

রুচিরা দ্বিধা-জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি কি এম্-এ পাশ করেছেন?'

সরিৎ বলিল,—'দুবার। ফিলজফিতে এবং সংস্কৃতে।'

দুই বোন পরস্পর মুখের পানে চাহিল।

ছন্দা বলিল,—'বেশ। কাল আমাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করবেন।' বলিয়া নিজেদের ঠিকানা দিল। যুবকের চোখের গাম্ভীর্য্য ও অধরোষ্ঠের ছেলেমানুষী গাঢ়তর হইল; সে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া প্রস্থান করিল।

গাড়ীতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ছন্দা একসময় গাড়ীর ভিতরকার আলো জ্বালিয়া রুচিরার দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রুচিরাও মুখ টিপিয়া হাসিল।

রুচিরার হাসিটি বড় মিষ্ট। আর ছন্দার—ছন্দার কথা বলিতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের রামেন্দ্র প্রশস্তির কথা মনে পড়ে—তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার চাহনি সুন্দর—ইত্যাদি।

পরদিন হইতে সরিৎ হালদার ছন্দা ও রুচিরার মাষ্টার নিযুক্ত হইল। কর্ত্তারা বুঝিলেন, ছোকরা দুঃস্থ এবং পণ্ডিত। মেয়েরা দেখিল, দুঃস্থ এবং পণ্ডিত হইলেও মাষ্টার সাধারণ লোক নয়। সে রুচিরার সহিত ইয়ার্কি দিবার চেষ্টা করিল না, ছন্দার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল না—চোখে গাম্ভীর্য্য ও অধরোষ্ঠে ছেলে-মানুষী ভাব লইয়া ছাত্রীদের সংস্কৃত ও ফিলজফি শিখাইতে লাগিল।

মাষ্টারের বয়স বোধ করি চব্বিশের বেশী নয়। মাথার চুল এলোমেলো, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, প্রত্যহ দাড়ি কামাইবার কথাও স্মরণ থাকে না। কিন্তু অদ্ভুত তাহার পড়াইবার ক্ষমতা

শুধু যে সে কঠিন বিষয়কে সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে তাহাই নয়, শিক্ষার্থিনীদের মনের মধ্যে কঠিন বস্তুকে তরল করিয়া তাহাদের সত্তার সহিত মিশাইয়া দিতে পারে। বিদ্যা তখন কেবল জ্ঞানের পর্য্যায়ে থাকে না, উপলব্ধির পর্য্যায়ে গিয়া উপস্থিত হয়। ছাত্রী দু'টি লেখাপড়ার মধ্যে তন্ময় হইয়া গেল।

কিন্তু চিরন্তনী শবরী ত লেখাপড়ার মধ্যে তন্ময় থাকে না। পরমা প্রকৃতির বিধি-বিধান অন্যরূপ। ছন্দা ও রুচিরার সুগহন অন্তর্লোকে হয়ত গোপনে গোপনে যে দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা তাহারা নিজেরাও ভাল করিয়া জানিতে পারে না।

জলের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোত প্রেরণ করিলে জল বিপরীত ধর্ম্মী দু'টি বাষ্পে পরিণত হয়; হাইড্রোজেন আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, অক্সিজেন নিজে না জ্বলিয়া অগ্নিকে আরও দীপ্তিমান করিয়া তোলে। আশ্চর্য্য প্রকৃতির ইন্দ্রজাল। ছন্দা ও রুচিরা এতদিন জলের মত ওতপ্রোতভাবে পরস্পর মিশিয়া ছিল, এখন যেন বিদ্যুতের সংস্পর্শে দ্বিধা হইয়া গেল। কবে এবং কখন এই সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ঘটিল, তাহা কেহ জানিল না।

দু'জনের পড়িবার ঘর একই; একটি টেবিলের দু'পাশে বসিয়া দু'জনে পড়াশুনা করে। মাষ্টার আসিয়া তৃতীয় দিকে বসেন, এবং নিরপেক্ষভাবে দুই ছাত্রীর পানে পর্য্যায়ক্রমে তাকাইয়া শিক্ষা দান করেন। মাষ্টারের এই অটল নিরপেক্ষতা বুঝি বা অন্তরে অন্তরে অনর্থের সৃষ্টি করে। নিরপেক্ষতা খুবই উচ্চ অঙ্গের চিত্তবৃত্তি; কিন্তু পক্ষপাতিত্বের একটা সুবিধা এই যে, কোনও পক্ষের মনেই সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

মাষ্টার সকাল বেলায় পড়াইতে আসেন। ছাত্রীরা আগে হইতেই পড়ার ঘরে বসিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করে। কোনও দিন হয়ত ছন্দার একটু দেরী হইয়া যায়, সে তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে প্রবেশ

করিয়া দেখে, মাষ্টার তখনো আসেন নাই, রুচিরা একটা নোটের খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

ছন্দা একবার রুচিরার মুখের দিকে তাকাইয়া নিজের চেয়ারে বসিতে বসিতে বলে,—'রুচি, তোর নাকের পাশে পাউডার লেগে আছে, মুছে ফ্যাল।'

রুচিরা আঁচল দিয়া নাকের পাশে ঘষিতে ঘষিতে হাসে, বলে,—'কালো রঙের ওপর পাউডারের জেল্লা খোলে বেশী। তোর কিন্তু কিছু বোঝা যায় না।'

ছন্দা একটা বইয়ের পাতা খুলিয়া বলে,—'নেয়ে উঠে একটা কিছু মুখে না মাখলে মুখটা যেন চট চট করে—'

রুচিরা বলে,—'হ্যাঁ। আজকাল রোজ সকালে নাওয়া আরম্ভ করেছিস দেখছি। আমি ভাই পারি না।'

ছন্দা ঈষৎ তপ্তমুখে বলে,—'সকালে না নাইলে চুল শুকোয় না। এলোচুলে কলেজে যাওয়া একটা অসভ্যতা।'

দুই ভগিনীর মিষ্টালাপ শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাষ্টার প্রবেশ করেন। ছাত্রীরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বসে।

মাষ্টার একটা বই তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—'ছন্দা, ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি, ফিলজফি পড়াবার সময় তুমি মন দিয়ে শোন না।'

ছন্দা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—'শুনি ত।'

মাষ্টারের চোখের গাম্ভীর্য্যের কাছে অধরের ছেলেমানুষী পরাভূত হইয়া পলায়ন করে, তিনি বলেন,—'শোন বটে কিন্তু মন দাও না।—আর, রুচিরা; তুমিও দেখছি, সংস্কৃত পড়ানোর সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়।'

রুচিরা অপরাধিনীর মত চক্ষু নত করিয়া থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে,—'আর অন্যমনস্ক হব না।'

মাষ্টার বলেন,—'বেশ! এস, আজ তোমাদের এথিক্‌স্ পড়াব।'

পাঠ আরম্ভ হয়।

কিন্তু ছাত্রীযুগল, মাষ্টার বিরক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া মনে মনে যেন কাঁটা হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য। একদিকে দুইটি ধনীর কন্যা, অভিজাত সমাজের মধ্যমণি বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না,—অন্যদিকে দুঃস্থ বেকার মাষ্টার। ইহাদের মধ্যে মাষ্টার-ছাত্রী সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধ কল্পনা করাও যায় না। অথচ—

ভারি আশ্চর্য্য।

কিন্তু মাষ্টার যদি শেষ পর্য্যন্ত দুঃস্থ বেকার মাষ্টারই রহিয়া যায়, তাহা হইলে নির্ম্মম কান্না অথবা নির্ম্মমতর হাসি ছাড়া এ কাহিনীর অন্য পরিসমাপ্তি সম্ভব হয় না। তাহা হইলে রুচিরার হাসি-কান্না আসে কোথা হইতে? এবং মাষ্টারের পরিপূর্ণ পরিচয়ই বা দেওয়া যায় কি করিয়া? যে মাষ্টার চিরদিন দুঃস্থ ও বেকার রহিয়া যায়, তাহার পরিচয় দিবার আগ্রহ আর যাহার থাকে থাক, আমার নাই। আমি রূপকথা বলিতেই ভালবাসি।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবার পর একদিন মাষ্টারের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কলেজে পড়ার তাড়া নাই, মাষ্টার সাধারণভাবে ছাত্রীদের সহিত কাব্য ও দর্শনের যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় ছন্দার বাবা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে কয়েক কেতা নোট।

মাষ্টারের মাহিনা তাহার হাতে দিতেই সে তাহা পকেটে রাখিয়া আবার আলোচনা আরম্ভ করিল।

ছন্দার বাবা হাইকোর্টের উকিল, তিনি একটি চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ মনঃসংযোগে আলোচনা শুনিলেন; তারপর সহসা মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাবার নাম কি?'

মাষ্টার একটু চমকিত হইল। কিন্তু বাপের নাম ভাঁড়াইতে কাহারও কাহারও চক্ষুলজ্জায় বাধে। সম্বিৎ হালদার যথার্থ

পিতৃনাম বলিল। নামের পুরোভাগে যে একটা রাজকীয় খেতাব ছিল তাহাও বাদ দিল না।

ছন্দার বাবা বলিলেন,—'হুঁ। কিন্তু তুমি এ ভাবে— ?'

সরিৎ বলিল,—'আপনারা একটু ভুল বুঝেছিলেন। আমি বেকার বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু নিজেকে দুঃস্থ বলিনি। সে সময় আমি বেকারই ছিলুম।'

ছন্দার বাবা বলিলেন,—'হুঁ—Suggestio falsi! কিন্তু এ অবস্থায়—'

সরিৎ বলিল,—'অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তনই ঘটেনি। বড় মানুষের ছেলে হয়ে জন্মানো শিক্ষক হবার অযোগ্যতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া ছন্দা আর রুচিরাকে পড়াতে আমার ভাল লাগে, ওরা খুব মেধাবিনী ছাত্রী।' বলিয়া নিরপেক্ষ স্নিগ্ধ চোখে দু'জনের পানে চাহিয়া হাসিল।

ছন্দা ও রুচিরা এই বাক্যালাপের সুরু হইতেই মাষ্টারের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া ছিল, এখনও তেমনি তাকাইয়া রহিল।

ছন্দার বাবা বলিলেন,—'তা বটে, কিন্তু—'

সরিৎ বলিল,—'আমি যেমন মাইনে নিচ্ছি, তেমনি নেব। আপনার ভয় নেই।'

সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। ছন্দার বাবা হাসিলেন, বলিলেন, 'বেশ কথা।'

তিনি প্রস্থান করিলে ছন্দা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া উত্তপ্ত-মুখে বলিল,—'আপনি এতদিন একথা লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন ?'

সরিৎ বলিল,—'না লুকোলে তোমাদের পড়াত কে ?'

'কেন, আর কি লোক ছিল না ?'

'ছিল। কিন্তু তারা রুচিরার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করত কিম্বা তোমার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকত। ফলে তোমরা পরীক্ষায় ফেল করতে।' মাষ্টারের স্বর গম্ভীর।

রুচিরার অধর একটু স্ফুরিত হইল, চোখের কূলে কূলে হাসি ভরিয়া উঠিল। মাস্টারের অধরে কিন্তু ছেলেমানুষীর চিহ্নমাত্র নাই।

ছন্দা যেন পরাস্ত হইয়া বসিয়া পড়িল; তারপর মিনতির স্বরে বলিল,—'বলুন না মাস্টার মশাই, সত্যি কেন লুকিয়েছিলেন?'

এতক্ষণে সরিতের অধরে ছেলেমানুষীর ভাব ফিরিয়া আসিল। সে বলিল,—'মিথ্যাকে সত্য করে তোলার নাম রোমান্স। রোমান্সের চূড়ান্ত হচ্ছে রূপকথা। আমি রূপকথা বড় ভালবাসি। ছদ্মবেশী রাজকুমারের কথা পড়েছ ত? আমি রাজকুমার নই, কিন্তু ছদ্মবেশের পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ করে নিয়েছি। এমন কি, ছদ্মবেশ ত্যাগ করবার পরও সে আনন্দ শেষ হয় নি।'

ছন্দা বলিল,—'ছদ্মবেশ?'

'হাঁ। এইটেই জীবনের সব চেয়ে বড় রোমান্স। অধিকাংশ মানুষই জানে না যে সে ছদ্মবেশ পরে বেড়াচ্ছে, পদে পদে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে। তাই তারা রূপকথার আনন্দ থেকে বঞ্চিত।'

ছন্দা সুন্দর অধর বিভক্ত করিয়া, দুই চোখে মুগ্ধ বিস্ময় ভরিয়া চাহিয়া রহিল; কালো মেয়ে রুচিরার কালো চোখে নিগূঢ় হাসি টলমল করিতে লাগিল।

সেরাত্রে শয়নের পূর্ব্বে রুচিরা অনেকক্ষণ ধরিয়া আয়নায় নিজেকে নিরীক্ষণ করিল। তারপর তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল আয়নার পাশে টাঙানো ছন্দার একটি ফটোর উপর। সে একটু একটু হাসিতে লাগিল। চকিতের জন্য তাহার দৃষ্টি আবার আয়নায় ফিরিয়া গেল। হঠাৎ সে একটু জোরে হাসিয়া উঠিল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে আলো নিবাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ছন্দা তাহার পাশের ঘরে শোয়। অনেক রাত্রে সে আসিয়া গা ঠেলিয়া রুচিরার ঘুম ভাঙাইয়া দিল—'এই রুচি, ওঠ—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফোঁপাচ্ছিস কেন?'

ঘুম ভাঙ্গিয়া রুচিরা কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল ; তারপর অস্ফুট স্বরে বলিল,—'স্বপ্ন দেখছিলুম। ভারি মজার স্বপ্ন। শুগে যা ছন্দা, আর ফোঁপাব না।'

দিন যায়। মাষ্টারও আসেন এবং যান। রুচিরা সমস্তদিন হাসে ; রাত্রে ঘুমের ঘোরে তাহার চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যায়। কি স্বপ্ন দেখে, কে জানে!

রুচিরা চালাক মেয়ে। অপ্রাপ্য বস্তুর পানে হাত বাড়াইয়া সে নিজেকে খেলো করিতে চায় না। ছন্দার গালদু'টিতে গোলাপ ফুটিয়া থাকে, চোখের চাহনীতে রূপকথার স্বপ্নাতুরতা। রুচিরা দেখিয়া হাসে ; সে-হাসি ছন্দার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। ছন্দার কপাল হইতে বুক পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলে না।

রুচিরা আগের মত পড়ার ঘরে বসিয়া মাষ্টারের প্রতীক্ষা করে না। আসিয়াছেন খবর পাইলে, কোনও মতে হাত-ফের দিয়া চুলগুলা জড়াইয়া নীচে নামিয়া যায়। নতনেত্রে বসিয়া অখণ্ড মনোযোগে মাষ্টারের বক্তৃতা শোনে ; তারপর পাঠ শেষ হইলে, একটু হাসিয়া দু'জনের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া যায়।

মাষ্টার হয়ত সবই লক্ষ্য করেন, কিন্তু তাঁহার তুলাদণ্ডের মত নিরপেক্ষতা তিলমাত্র বিচলিত হয় না, চোখের গাম্ভীর্য্য ও অধরের চটুলতা আরও পরিস্ফুট হয় মাত্র।

একদিন সকালে মাষ্টার পড়াইতে আসিলেন না। ছন্দা টেবিলের সম্মুখে বসিয়া ছটফট করিতে লাগিল, মুহুর্মুহু দেওয়ালের ঘড়ির সঙ্গে চোখাচোখি হইল। ঘড়ি নির্বিকার মুখে টিক টিক শব্দ করিয়া চলিল। রুচিরা নিবিষ্ট চিত্তে মৃচ্ছকটিক পড়িতে পড়িতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সকাল কাটিয়া গেল।

ছুটির দিন ছিল। বৈকাল বেলা রুচিরা পড়ার ঘরে অলসভাবে

বসিয়া একটা খাতায় হিজিবিজি কাটিতেছিল, অযত্নবদ্ধ চুলগুলো কাঁধের উপর খসিয়া পড়িতেছিল।

অন্যমনস্কভাবে সে খাতায় লিখিল—

যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।

আজ সকালে সে হঠাৎ ছন্দার চোখে জল দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নানা আবোল-তাবোল চিন্তা মাথায় আসিতে লাগিল। মগ্ন-চৈতন্য জিনিসটা কি? যত নিগৃহীত আশা আকাঙ্ক্ষা সব কি ডানা-ভাঙা পাখীর মত সেইখানে গিয়া আশ্রয় লয়?…মৃচ্ছকটিকে ধূতার চরিত্রটি কেমন? নিজের স্বামীকে বসন্তসেনার হাতে তুলিয়া দিল! কিন্তু—

ছন্দা বাহিরে যাইবার বেশে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—'রুচি আমি মাসীমার বাড়ী যাচ্ছি; তাঁর কি হয়েছে, ডেকে পাঠিয়েছেন।'

কবিতার পংক্তিগুলি কাটিতে কাটিতে রুচি বলিল, 'আচ্ছা।'

ছন্দা যেন আরও কিছু বলিবে এমনিভাবে একটু ইতস্তত করিয়া চলিয়া গেল।

…রূপকথার রাজপুত্রেরা ছদ্মবেশ পরিয়া কিসের খোঁজে বাহির হন? সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ এক ভোমরা? সাপের মাথার মাণিক? অপরূপ রূপসী রাজকন্যা…

পাশের ঘরটা ড্রয়িংরুম; সেখানে টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। রুচিরা অলস পদে উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

'কে আপনি?'

ভারি গলায় জবাব আসিল,—'আমি সরিৎ। তুমি কে? রুচিরা?'

রুচিরার গলা যেন বুজিয়া গেল,—'হাঁ—আজ আসেন নি কেন?'

'কাজ ছিল।'

হাসিবার চেষ্টায় রুচিরার গলা কাঁপিয়া গেল—'আজ আপনার প্রথম কামাই। জরিমানা হবে।'

'জরিমানা করবে কে?'

'—ছন্দা।'

'ও! ভাল।—শোন, তোমার বাবা-কাকাবাবু এঁরা বাড়ীতে আছেন?'

'হ্যাঁ। আজ ছুটি। কেন?'

'দরকার আছে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি!—তোমাদের না হয় পড়িয়ে আসব।'—একটু ইতস্তত করিয়া—'ছন্দা নিশ্চয় বাড়ীতে আছে?'

'না। ছন্দা মাসীমার বাড়ী গিয়েছে।'

মনে হইল তারের অপর প্রান্ত হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসিল।

রুচিরা হঠাৎ ধৃষ্টতা করিয়া বসিল—'দুঃখ হচ্ছে বুঝি?'

'রুচিরা, তোমরা আমার ছাত্রী না?'

'দোষ করেছি, মাপ করুন।'

'আচ্ছা। তুমি বাড়ীতে থাকবে ত?'

'থাকব।'

'আমি যাচ্ছি।—হ্যাঁ, শোনো! একটা কথা জানো?'

'কি?'

'হাসি-কান্নার মত দীর্ঘ নিশ্বাসেরও দু'রকম মানে হয়।'

'বুঝতে পারছি না।'

'হাসিতে কি খালি আনন্দই বোঝায়? কান্না কি কেবল দুঃখেরই প্রতীক?'

'এখনও বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা—আমি যাচ্ছি—'

রুচিরা ফিরিয়া আসিয়া পড়ার ঘরে বসিল। নিতান্তই স্ত্রী-

স্বভাববশত নিজের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি পড়িল। শাড়ীটা আধময়লা, ব্লাউজ এককালে নূতন ছিল, এখন ধোপার কল্যাণে স্থানে স্থানে রং উঠিয়া গিয়াছে। তা হোক ক্ষতি কি? অসহিষ্ণু হস্তে স্খলিত চুলগুলা রুচিরা টান করিয়া পিছনে জড়াইল। চুলগুলা একটা জঞ্জাল!—মেমেদের মত বব করিলে কেমন হয়!

দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম শেষ করিয়া বাবা ও কাকা ড্রয়িংরুমে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের কথার গুঞ্জন মাঝের ভেজানো দরজা দিয়া অস্পষ্টভাবে আসিতে লাগিল।

আধঘণ্টা কাটিল। একটি পরিচিত পদধ্বনি পড়ার ঘরের সম্মুখ দিয়া গিয়া ড্রইংরুমের গালিচার উপর বিলুপ্ত হইল। বাবা ও কাকার সম্ভাষণ শোনা গেল,—'এস সরিৎ।'

তারপর তাঁহাদের বাক্যালাপ আবার গুঞ্জন-ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—কথা যেন আর শেষ হয় না।

রুচিরা উঠিয়া একবার ভেজানো দরজার সম্মুখ দিয়া অলস নিঃশব্দ পদে হাঁটিয়া গেল। সরিতের কণ্ঠের দুই তিনটি কথা তাহার কানে গেল। সে আবার পা টিপিয়া নিজের স্থানে আসিয়া বসিল।

ও—এই কথা। টেলিফোনে কথাবার্ত্তার ভঙ্গী হইতেই রুচিরার বোঝা উচিত ছিল। বিবাহের প্রস্তাব। পাত্রীর নামটি শোনা না গেলেও ছন্দা ছাড়া আর ত কেহ হইতে পারে না।

আরো অনেকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত রুচিরা বসিয়া রহিল।...স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয়?...সহসা চমক ভাঙ্গিয়া সে দেখিল, সরিৎ আসিয়া টেবিলের অপর পাশে দাঁড়াইয়াছে। তাহার অধরের ছেলেমানুষী কোন অভাবনীয় উপায়ে চোখের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে।

রুচিরা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরিৎ কপট-কঠোর স্বরে বলিল,—'কাজিল মেয়ে।'

'কি করেছি?'

সরিৎ উত্তর না দিয়া তাহার পানে কেবল কপট-কঠোর চক্ষে চাহিয়া রহিল।

রুচিরা তখন কৌতুক-তরল হাসিতে হাসিতে বলিল,—'বসুন, মাষ্টার মশাই। আচ্ছা, এখনও কি আপনাকে মাষ্টার মশায় বলতে হবে?'

সরিৎ বলিল, 'না।' তারপর যেন একটু বিবেচনা করিয়া বলিল,—'এখন তুমি আমাকে—বর বলতে পার। কর্ত্তারা অনুমতি দিয়েছেন।'

* * *

অদম্য আবেগে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া রুচিরা কাঁদিতেছে। সরিৎ তাহার পাশে আসিয়া অযত্নবদ্ধ চুলগুলি খুলিয়া দিয়া বলিল,—'চুল খুলে কাঁদতে হয়। কালিদাস বলেছেন,—বিললাপ বিকীর্ণ-মুর্দ্ধজা।'

অশ্রুপ্লাবিত মুখ ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া রুচিরা বলিল,—'কিন্তু আমি যে কালো!'

সরিৎ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বিকীর্ণকুন্তল মাথার পানে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল, তারপর স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বলিল,—'ওটা তোমার ছদ্মবেশ। তুমিই আমার রূপকথার রাজকন্যা।'

গ্রন্থকার

প্রকাশকের জরুরী তাগিদে সেদিন ন'টা পঁচিশের লোকালে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলাম। আন্দাজ ছিল, সাড়ে দশটা বাজিতে বাজিতে হাওড়ায় পৌঁছিয়া কলিকাতার কাজ কর্ম্ম সারিয়া দেড়টার গাড়ীতে আবার বাড়ী ফিরিব।

আমাদের ষ্টেশনে মাত্র আধ মিনিট গাড়ী দাঁড়ায়; তাই দেখিয়া শুনিয়া একটা নির্জ্জন কামরা খুঁজিয়া লওয়া সম্ভব হইল না, সম্মুখে যে ইণ্টারক্লাশ কাম্‌রাটা পাইলাম তাহাতেই উঠিয়া পড়িতে হইল। গাড়ী তখন আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুইখানি করিয়া সমান্তরাল বেঞ্চি লোহার গরাদ দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে অনেকগুলা লোকাল্ প্যাসেঞ্জার একত্র হইয়া কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি না করে। আমি যে কুঠ্রীতে ঢুকিয়াছিলাম তাহাতে গুটি চার-পাঁচ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। দুই পাশের অন্য খাঁচাগুলিতেও দু'চারজন করিয়া লোক ছিলেন। তাঁহাদের চেহারা দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে ছাড়া পাইলেই তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবেন। যাহোক সাবধানে একটু কোণ ঘেঁষিয়া বসিলাম।

আমার পাশে বসিয়া একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক একাগ্রভাবে একখানা বই গিলিতেছিলেন। অন্য কোনো দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বোধ হয় আবেগের প্রাবল্যেই তাহার কাঁচা-পাকা দেড় ইঞ্চি চওড়া গোঁফ নড়িয়া উঠিতেছিল, কোটরাগত চক্ষু জ্বলজ্বল করিতেছিল। ভারী চোয়াল চিবানোর ভঙ্গীতে নাড়িয়া তিনি মাঝে মাঝে গলা দিয়া একপ্রকার শব্দ বাহির করিতেছিলেন—গর্‌র্‌—র্‌—

কি এমন বই যাহা ভদ্রলোককে এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে?

জিরাফের মত গলা উঁচু করিয়া বইখানার নাম পড়িলাম—নীল রক্ত! বইখানা পরিচিত—লেখকের নাম প্রদ্যোত রায়। মাস কয়েক পূর্ব্বে বইটি বাহির হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

পাশের খাঁচা হইতে এক ভদ্রলোক গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্যারীদা, অত মন দিয়ে কি পড়ছেন?'

পুস্তকপাঠনিরত ব্যক্তিই প্যারীদা। তিনি মুখ তুলিয়া সক্রোধে খ্যাঁক খ্যাঁক করিয়া হাসিলেন, বলিলেন,—'পদা ছোঁড়ার কেলেঙ্কারী দেখছি! কি ল্যাখাই লিখেছেন! মরি মরি! এই বই নিয়ে আবার তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে। বইখানা বিশে লাইব্রেরী থেকে এনেছিল। ভাবলুম, দেখি ত পদা কি লিখেছে। ছেলেবেলা থেকেই ছোঁড়াকে জানি—আমার শ্যালীর সম্পর্কে ভাসুরপো হয়।—তা, যে বিদ্যে ছর্‌কুটেছেন সে আর কহতব্য নয়।'

সকলে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—'নাম কি বইখানার।'

প্যারীদা তাচ্ছিল্যসূচক গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন,—'নীল রক্ত। যেমন নাম, তেমনি বই। আরে, তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল, পদা আবার বই লিখবে। মেনি মুখো একটা ছোঁড়া, তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে—'

আর একজন বলিলেন,—'নীল্ রক্ত! বইখানার নাম শুনেছি বটে—সেদিন বোসেদের গুপে বলছিল বইখানা ভাল হয়েছে। গুপে বাংলা বইয়ের খবর টবর রাখে। তা লেখককে আপনি চেনেন নাকি?'

প্যারীদা বলিলেন,—'বললুম না, আমার শ্যালীর ভাসুরপো?—বাঘ-আঁচড়ায় থাকে, চালচুলো কিছু নেই। রোগা সিড়িঙ্গে হাড়-বার করা ছোঁড়া, মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নেই, কথা কইতে গেলে তিনবার হোঁচট্ খায়—সে আবার বই লিখবে! হেসে আর বাঁচি না!'

গ্রন্থকার শব্দটার মধ্যে কি একটা সম্মোহন আছে, বিশেষত কেহ যদি বলে আমি অমুক লেখককে চিনি তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, দেখিতে দেখিতে সে সকলের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে। প্যারীদাও গাড়ীসুদ্ধ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গালে এক গাল পানদোক্তা পুরিয়া মৃদু-মন্দ রোমন্থন করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—'প্যারী, তুমি ত দেখছি ছোকরার ওপর বেজায় চটে গেছ। গল্পটা কি লিখেছে বল দেখি—আমরাও শুনি।'

প্যারীদা বলিলেন,—'লিখেছে আমার মুণ্ড আর তার বাপের পিণ্ডি।'

"আহাহা, গল্পটা বলই না ছাই।'

'গল্প না ঘণ্টা—এক বুনিয়াদি জমিদার বংশের ছেলের কেচ্ছা। আস্বা দেখে হাসি পায়! তোর বাপ ত হল গিয়ে সবপোস্ট-অফিসের পোস্ট্‌মাস্টার—তুই জমিদারের ছেলে কখনো চোখে দেখেছিস যে তাদের কেচ্ছা লিখতে গেলি? একেই বলে পেটে ভাত নেই কপালে সিঁদুর।—আমি যদি ও গল্প লিখতুম তাহলেও বা কথা ছিল। নিজে ছাপোষা বটে কিন্তু ত্রিশবচ্ছর ধরে দু'বেলা জমিদারের বৈঠকখানায় আড্ডা দিচ্ছি—তাদের নাড়ি থেকে হাঁড়ি পর্য্যন্ত সব খবর রাখি।—বলুন ত মশায়?' বলিয়া প্যারীদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরিলেন।

প্যারীদার কথা শুনিতে শুনিতে কেমন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, জগৎটাই মায়াময় বোধ হইতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'সে ত ঠিক কথা, কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু নয়—খাঁটি কথা। লেখার অভ্যেস নেই এই যা, নইলে এমন গল্প লিখতে পারতুম যে পদার বাবাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত।'

পূর্ব্বোক্ত পান-চর্ব্বণ-রত ভদ্রলোক বলিলেন,—'কিন্তু গল্পটাই যে তুমি বলছ না হে!'

প্যারীদা বলিলেন,—'গল্পর কি আর মাথা মুণ্ডু আছে! যত সব

উদ্ভট ব্যাপার। শুনতে চাও ত বলছি।' বলিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আমার একবার সন্দেহ হইল, প্যারীদা গল্পটা সকলকে শুনাইবার জন্যই এতটা তাল ঠুকিতেছিল। যাহারা গল্প বলিতে জানে, শ্রোতার মনকে তৈয়ার করিয়া লইতেও তাহারা পটু! দেখিলাম, চলন্ত গাড়ীর শব্দের ভিতর হইতে প্যারীদার গল্প শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছে। প্যারীদার মুখের উপর একটা তৃপ্তির ভাব ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া গেল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শেক্সপীয়রের মত এক একজন প্রতিভাবান লোক আছে, যাহারা পরের গল্প আত্মসাৎ করিয়া তাহার চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। দেখিলাম প্যারীদারও সেই শ্রেণীর প্রতিভা। বইখানা কেমন হইয়াছে তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কিন্তু প্যারীদার বলার ভঙ্গীতে গল্প জমিয়া উঠিল। আমি তাঁহারই কথায় যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে গল্পটাকে উদ্ধৃত করিলাম।

এক মস্ত জমিদার বংশ; তিনশ' বছর ধরে চলে আসছে। তিন লক্ষ টাকা বছরে আয়, সাতমহল বাড়ী, এগারোটা হাতী, বাওয়ান্নটা ঘোড়া; লাঠি সড়কি বরকন্দাজ মশাল্‌চি হুঁকাবরদার—চারিদিকে গিশ গিশ করছে। মোটের ওপর, একটা রাজপাট বললেই হয়।

সেকালে জমিদারেরা ভীষণ দুর্দ্দান্ত ছিল। ডাকাতি, গুমখুন, গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া—এমন কাজ নেই যা তারা করত না। তাদের এক বিধবা মেয়ের নাকি চরিত্র খারাপ হয়েছিল—জমিদার জানতে পেরে নিজের মেয়ে আর তার উপপতিকে ধরে এনে নিজের বৈঠকখানা ঘরের মেঝেয় পুঁতে আবার রাতারাতি মেঝেয় শান্ বাঁধিয়ে ফেলেছিল। তাদের অত্যাচার আর দাপটের কত কাহিনী যে প্রচলিত ছিল তার শেষ নেই। আশে-পাশের জমিদারেরা তাদের যমের মতন ভয় করত। শোনা যায়, সীমানার এক ঘাটোয়ালের সঙ্গে দখল নিয়ে তকরার হওয়াতে সেই ঘাটোয়ালকে তার বাড়ী

থেকে লোপাট করে এনে অমাবস্যার রাত্রে মা কালীর সাম্‌নে বলি দিয়েছিল।

আজকাল অবশ্য সে সব আর নেই—তবে রাজপাট ঠিক বজায় আছে। বর্ত্তমান জমিদারের একমাত্র ছেলে, তার নাম অহীন্দ্র। সেই হল গিয়ে এই গল্পের নায়ক। সে রীতিমত ইংরেজী লেখা পড়া শিখেছে, কলকাতায় প্রকাণ্ড বাসা করে থাকে। সে বড় ভাল ছেলে। বড় শান্ত প্রকৃতি তার—পূর্ব্বপুরুষদের দুর্দ্দান্ত স্বভাব একটুও পায় নি—সাত চড়ে মুখে রা নেই। চেহারাও চমৎকার—লেখাপড়াতেও ধারালো। এক কথায় যাকে বলে হীরের টুক্‌রো ছেলে।

এই ছেলে লেখাপড়া করতে করতে হঠাৎ এক ব্যারিষ্টারের মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। সে ব্যারিষ্টারের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করলে। ব্যারিষ্টারটির বাইরের ঠাট ঠিক আছে; কিন্তু ভেতরে একেবারে ভুয়ো—আকণ্ঠ দেনা। তাঁর মেয়ে মনীষা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে; সুন্দরী শিক্ষিতা বটে কিন্তু ডেঁপো চালিয়াৎ নয়—শান্ত ধীর নম্র। সেও মনে মনে অহীন্দ্রকে ভালবেসে ফেললে।

কিন্তু প্রেমের পথ বড়ই কুটিল; এতবড় জমিদারের ছেলেও দেখলে তার প্রিয়তমাকে পাবার পথে দুস্তর বাধা। অর্থাৎ মনীষার আর একটি উমেদার আছে। উমেদারটি আর কেউ নয়—ব্যারিষ্টার সাহেবের পাওনাদার। লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, অবিবাহিত, বিলেত ফেরৎ এবং টাকার আণ্ডিল। তার নামে মাঝে মাঝে কিছু কাণাঘুষোও শোনা যেত—কিন্তু যার অত টাকা তার নামে কুৎসা কে গ্রাহ্য করে?

ব্যারিষ্টার সাহেবের চরিত্র অতি দুর্ব্বল। তিনি মেয়েকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু পাওনাদারের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। তাই, ইচ্ছা থাকলেও অহীন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছেন না। অহীন্দ্রও স্পষ্ট করে কোন কথা বলে না, কেবল আসে যায়, গল্প করে, চা চায়—এই পর্য্যন্ত। তার

মনের ভাব হয়ত কেউ কেউ বুঝতে পারে, কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করে না। এমনি ভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

ছ'মাস পরে একদিন কথায় কথায় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর মনের ভাব জানতে পারলে। তিনি মনীষাকে বিয়ে করতে চান না—বিয়েতে তাঁর ভারি অরুচি—তাঁর মতলব অন্য রকম। কিন্তু মনীষা ভালমানুষ হলেও ভারি শক্ত মেয়ে, সে ও-সবে রাজী নয়। ব্যারিষ্টার সাহেব সবই বোঝেন কিন্তু পাওনাদারকে চটাবার সাহস তাঁর নেই—তিনি কেবল চোখ বুজে থাকেন। কিন্তু তবু পাওনাদার বাবু সুবিধা করে উঠতে পারছেন না।

এই ব্যাপার জানতে পেরেও অহীন্দ্র কোনো কথা বললে না, চুপ করে রইল। সে এতই ভালমানুষ যে, পাওনাদার বাবু তার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনেও সে কোনো দিন তাঁর প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা দেখায় নি। দু'জনের মধ্যে বেশ সদ্ভাবই ছিল। পাওনাদার বাবু অহীন্দ্রকে গোবেচারি ভ্যাড়াকান্ত মনে ক'রে ভেতরে ভেতরে একটু কৃপার চক্ষেই দেখতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর অহীন্দ্র ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীতে এসে দেখলে, মনীষা বাগানে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। অহীন্দ্র নিঃশব্দে বাগান থেকে ফিরে চলে এল।

পরদিন বিকেল বেলা অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করে বললে,—'আপনার সঙ্গে একটা ভারি গোপনীয় কথা আছে—কিছু টাকা ধার চাই। কাজটা কিন্তু খুব চুপিচুপি সারতে হবে—বাবা না জানতে পারেন।'

বড়লোকের ছেলেদের টাকা ধার দেওয়াই পাওনাদার বাবুর ব্যবসা, তিনি খুশী হয়ে বললেন,—'বেশ ত! আজ রাত্রি দশটার সময় আপনি আমার বাড়ীতে যাবেন। কেউ থাকবে না—চাকর বাকরদেরও সরিয়ে দেব।'

রাত্রি দশটার সময় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর বাড়ীতে পায়ে হেঁটে

উপস্থিত হল; দেখলে, গৃহস্বামী ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই। তখন দু'জনে টাকার কথা আরম্ভ হল।

অহীন্দ্র বিশ হাজার টাকা ধার চায়। কিন্তু সুদের হার নিয়ে একটু কষাকষি চলতে লাগল। অহীন্দ্র বললে সে শতকরা দশ টাকার বেশী সুদ দিতে পারবে না। পাওনাদার বাবু বললেন তিনি শতকরা পনের টাকার কম সুদ নেন না। তার কারণ যারা তাঁর কাছে ধার নেয় তাদের নাম কখনো জানাজানি হয় না—গোপন থাকে। অহীন্দ্র তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে। তখন তিনি লোহার আলমারি খুলে অন্যান্য তমসুক বার করে দেখালেন যে সকলেই শতকরা পনের টাকা হারে সুদ দিয়েছে।

এই সময় টেবলের ওপর আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। তার পর অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি হল কেউ জানেন না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অহীন্দ্র যথারীতি ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী গিয়ে শুনলে যে পাওনাদার বাবু হঠাৎ মারা গেছেন। কিসে মারা গেছেন কেউ বলতে পারলে না। তবে তাঁর চরিত্র ভাল ছিল না, তাই অনেকেই অনুমান করলে যে এর মধ্যে স্ত্রীলোক ঘটিত কোনো ব্যাপার আছে।

এই ঘটনার সাতদিন পরে ব্যারিষ্টার সাহেব বুক্-পোষ্টে একটা কাগজের তাড়া পেলেন। খুলে দেখলেন, কোন অজ্ঞাত লোক তাঁর তমসুকখানি পাঠিয়ে দিয়েছে।

অতঃপর জমিদারের সুবোধ শান্ত ছেলের সঙ্গে ঋণমুক্ত ব্যারিষ্টারের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। প্রেমিক প্রেমিকার মিলন হল।

প্যারীদা বলিলেন,—'শুনলে ত গল্প ?'

সকলে চুপ করিয়া রহিল। ট্রেণ এতক্ষণ প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিতে থামিতে প্রায় গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বেলুড়ে গাড়ী ধরিতেই, একটি পুরাদস্তুর তরুণ আমাদের কামরায় প্রবেশ

করিয়া রুমালে সন্তর্পণে গদি ঝাড়িয়া উপবেশন করিল এবং চওড়া কালো ফিতার প্রান্তে বাঁধা প্যাঁশ-নে চশমার ভিতর দিয়া আমাদের সকলের দিকে একবার অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিল।

গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নীল রক্ত বইখানা প্যারীদা'র হাতেই ছিল; তরুণ এতক্ষণে সেটার নাম দেখিতে পাইয়া মুরুব্বিয়ানা চালে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'কেমন পড়লেন বইখানা? ওটা আমার লেখা।'

আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া তরুণের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। প্যারীদা কিয়ৎকালের জন্য একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, তারপর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—'তোমার লেখা? কে হে তুমি ছোকরা? এ বই পদার লেখা—আমার শালীর ভাস্থরপো পদা।'

তরুণ অবিচলিত ভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল,—'আপনার শ্যালীর ভাস্থর থাকতে পারে এবং সেই ভাস্থরের পদা নামক ছেলে থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু বইখানা আমার লেখা। আমার নাম—প্রদ্যোত রায়।'

গাড়ীসুদ্ধ লোক এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। যাহারা দূরের খাঁচায় ছিল তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া একদৃষ্টে তরুণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তরুণ বলিল,—'পদা নামধারী কোন ব্যক্তির বই লেখা সম্ভব নয়।—দেখি বইখানা।' বলিয়া তরুণ হাত বাড়াইল।

প্যারীদা'র মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি এখনি বইখানি জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু লাইব্রেরীকে দেড় টাকা গুনাগার দিতে হইবে এই ভয়েই বোধ হয় তাহা করিলেন না। তরুণ বইখানা লইয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া বলিল,—'শুনুন, মুখস্থ বলছি—১০৯ পৃষ্ঠায় আছে—"সভ্যতা ও ধর্ম্মভয় মানুষের গায়ে ক্ষীণতম পালিশ মাত্র; জীবনের অবিশ্রাম ঘর্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়া ভিতরের

প্রকৃত মনুষ্যমূর্ত্তি কখনো কখনো বাহির হইয়া পড়ে। তখন সেই আদিম সভ্যতালেশবর্জ্জিত নখদন্তায়ুধ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। বুঝিতে পারি না যে, আমাদের সকলের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে—প্রয়োজন হইলেই সে ছদ্মবেশ ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অনেকের জীবনেই সে প্রয়োজন আসে না—কিন্তু যাহার আসে,—' তরুণ মুচকি হাসিয়া বলিল,—'এখনো কি আপনি বলতে চান যে এ লেখা আপনার পদার হাত থেকে বেরিয়েছে ?'

প্যারীদা এবার একেবারে নিবিয়া গেলেন, অতি কষ্টে অসংলগ্ন ভাবে বলিলেন,—'পদা—মানে পদার নামও প্রদ্যোত রায়, তাই আমি—'

বিজয়ী তরুণ সহাস্যে আমার দিকে ফিরিল,—'আপনি বইটা পড়েছেন কি ?' আমার চেহারা দেখিয়া আমাকেই বোধ হয় সে এই দলের মধ্যে সব চেয়ে শিক্ষিত মনে করিয়াছিল।

আমি কি আর বলিব, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিলাম,—'হ্যাঁ। প্রুফ সংশোধন করবার সময় একবার পড়েছিলুম, তার পর আর পড়া হয়নি।'

তরুণ বলিল,—'ও! আপনি ছাপাখানায় কাজ করেন ?'

কথাটা একটু গায়ে লাগিল। ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, আমি বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, 'না। বইখানা আমারই লেখা।'

তরুণ উচ্চকিত ভাবে আমার পানে তাকাইল, একটু অস্বস্তির ভাব তাহার মুখে দেখা দিল। সে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—'আপনি বলতে চান—?'

মনকে কঠিন করিলাম। পকেট হইতে একটা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম,—'আপনারা রাগ করবেন না কিন্তু আমিই প্রদ্যোত রায়। খাঁটি এবং অকৃত্রিম—ভেজাল নেই। বিশ্বাস

না হয় এই পোষ্টকার্ডখানা পড়ে দেখুন—'নীল রক্ত'র দ্বিতীয় সংস্করণ বার হবে তাই প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।'

সঙ্কুচিতভাবে পোষ্টকার্ডখানা প্যারীদা'র দিকে বাড়াইয়া দিলাম, তিনি কেবল হিংস্রভাবে আমার পানে তাকাইলেন।

গাড়ী প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া থামিল। আমি কার্ডখানা তরুণের দিকে বাড়াইবার উপক্রম করিতেই সে দ্রুত প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তন্দ্রাহরণ

[ঐতিহাসিক কাহিনী]

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রার মন একেবারে খিঁচড়াইয়া গিয়াছে। মধুমাসের সায়াহ্নে তিনি তাই প্রাসাদশিখরে উঠিয়া একাকিনী দ্রুত পায়চারি করিতেছেন এবং গণ্ড আরক্তিম করিয়া ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম।

অনেক দিন আগেকার কথা। ভারতীয় রমণীগণের মন তখন অতিশয় দুর্দ্দমনীয় ছিল; মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কনৌজে সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী তন্দ্রার বয়স আঠারো বৎসর, ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন। তথাপি মধুমাসের সায়াহ্নে তাঁহার মন কেন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার আসন্ন বিবাহই একমাত্র কারণ।

কিন্তু আঠারো বছরের বিকশিতযৌবনা কুমারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন? একালে তো এমনটা দেখা যায় না! তবে কি সেকালে—

না তাহা নয়। সেকালেও এমনই ছিল। কিন্তু কুমারী তন্দ্রার

আপত্তির কারণ, তাঁহার মনোনীত স্বামী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ চন্দ্রানন মাণিক্য। কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আসল কথা—বর বাঙাল।

যতদিন এই বিবাহ রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল, ততদিন কুমারী তন্দ্রা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। যুবরাজ চন্দ্রানন বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে রাজধানীতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়াছেন।

গোড়া হইতেই তন্দ্রার মন বাঁকিয়া বসিয়াছে। তবু তিনি গোপনে প্রিয় সখী নন্দাকে পাঠাইয়াছিলেন—চন্দ্রানন মাণিক্য লোকটি কেমন দেখিবার জন্য। নন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—যুবরাজ দেখিতে শুনিতে ভালই, চালচলনও অতি চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষা একেবারে অশ্রাব্য। 'ইসে' এবং 'কচু' এই দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ সহযোগে তিনি যাহা বলেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।

শুনিয়া কুমারী তন্দ্রা একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। এ কি অত্যাচার! তিনি রাজকুমারী বলিয়া কি তাঁহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? হউক সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ—তবু বাঙাল তো! দেশে কি আর রাজপুত্র ছিল না? আর রাজপুত্র ছাড়া রাজকুমারী বিবাহ করিতে পারিবে না এই বা কেমন কথা!

কুমারী তন্দ্রা রাজসভায় নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া তীব্র লিপি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরামর্শিত হইয়া রাজা কন্যাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, চন্দ্রানন মহা বীরপুরুষ, উপরন্তু বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে বিবাহে অস্বীকৃত হইলে নিশ্চয় কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গোঁ অতি ভয়ানক বস্তু। সুতরাং বিবাহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তদবধি ক্রোধে অভিমানে তন্দ্রার চোখে তন্দ্রা নাই। তাই মধুসায়াহ্নে একাকী প্রাসাদশীর্ষে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে গণ্ড

আরক্তিম করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম!

সহসা একটি তীর হাউইয়ের মত প্রাসাদপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া তন্দ্রার পদপ্রান্তে পড়িল। বিস্মিত তন্দ্রা চারিদিকে চাহিলেন। রাজপ্রাসাদ-শীর্ষে কোন্ ধৃষ্ট তীর নিক্ষেপ করিল? তন্দ্রা ছাদের কিনারায় গিয়া নিম্নে উঁকি মারিলেন।

ঠিক নীচেই জলপূর্ণ পরিখা প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার পরপারে একটি উষ্ণীষধারী যুবক ঊর্দ্ধমুখ হইয়া গুম্ফে তা দিতেছে। তন্দ্রাকে দেখিতে পাইয়া সে হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

চতুস্তল প্রাসাদের শিখর হইতে যুবকের মুখাবয়ব ভাল দেখা গেল না; তবু সে যে বলিষ্ঠ ও কান্তিমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্দ্রা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তীরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে।

লিপি খুলিয়া তন্দ্রা পড়িলেন—

"ছলনাময়ী নন্দা, আর কতদিন দূর হইতে দেখিয়া অতৃপ্ত থাকিব? তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ কর; আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না। যদি আমাকে বঞ্চনা কর, নিজেই পরিতাপ করিবে। পরদেশী বন্ধু কতদিন থাকে?

সদয়া হও—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। একবার সাক্ষাৎ হয় না?—তোমার অনুগত বন্ধু।"

লিপি পড়িয়া কুমারী তন্দ্রা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল ইদানীং প্রিয় সখী নন্দা যখন তখন ছলছুতা করিয়া ছাদে আসে। এই তাহার অর্থ! ঐ কমকান্তি বিদেশী নন্দাকে দেখিয়া মজিয়াছে; নন্দাও নিশ্চয় তাহার প্রতি আসক্ত। দুইজনে কাছাকাছি হয় নাই, দূর হইতেই প্রণয়। তীরের মুখে প্রেম!

সহসা তন্দ্রার দুই নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি সন্তর্পণে

উঠিয়া গিয়া আবার উঁকি মারিলেন। ধৈর্য্যশীল যুবক তখনও ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফে তা দিতেছে।

কবরী হইতে কাজললতা লইয়া চুলের কাঁটা দিয়া তন্দ্রা লিপি লিখিলেন, হাত কাঁপিতে লাগিল। লিপি শেষ হইলে তীরের গায়ে জড়াইয়া পরপারে ফেলিয়া দিলেন। নিরুদ্ধনিশ্বাসে দেখিলেন, যুবক সাগ্রহে তীর তুলিয়া লইল।

* * *

নন্দা ছাদে আসিয়া তন্দ্রাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, 'প্রিয় সখি, তুমি এখানে?'

তন্দ্রা তপ্তমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা ছাদের এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর বলিল, 'কতক্ষণ এখানে এসেছ?'

তন্দ্রা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; 'নন্দা, আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। হয়তো কাল সকালে উঠে আর আমায় দেখতে পাবি না। সখি তোর কাছে যদি কখনও অপরাধী হই, ক্ষমা করিস।'

নন্দা রাজকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছি সখি, ও কথা বলতে নেই। চল, নীচে চল। কাজললতা যে প'ড়ে রইল, আমি নিচ্ছি। চুলের কাঁটাও খ'সে পড়েছে দেখছি! সখি, উতলা হয়ো না; তোমার ভাগ্যদেবতা তোমায় নিয়ে হয়তো একটু পরিহাস করছেন, দেবতার পরিহাসে কাতর হলে কি চলে?'

শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুভরা স্বরে তন্দ্রা কহিলেন, 'নন্দা, আজ রাত্রে আমি একা শোব, তুই যা। আর দেখ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সেই বর্ব্বরটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, তুই নিস।'—মনে মনে বলিলেন, 'অদল-বদল।'

নন্দা জিভ কাটিয়া চোখে আঁচল দিল, 'ওমা ওকি কথা! আমি

যে তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই।'—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। নন্দার এই পলায়ন একেবারে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া থামিল।

* * *

রাত্রি দ্বিপ্রহরের যাম-ঘোষণা থামিয়া যাইবার পর, রাজকুমারী তন্দ্রা প্রাসাদের গুপ্ত পথ দিয়া পরিখা পার হইয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহার বরতনু বেষ্টন করিয়া আছে রাত্রির মতই নিবিড় নীল একটি ঊর্ণা।

নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে একটি তরুণ সুদৃঢ় হস্ত আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কেহ কথা কহিল না; দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল, তরুণ সুদৃঢ় হস্ত তন্দ্রাকে একটির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিল; তারপর এক লম্ফে অপরটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে দুই কৃষ্ণকায় অশ্ব ছুটিয়া চলিল, পৌণ্ড্রভুক্তির সীমান্ত লক্ষ্য করিয়া।

দণ্ড কাটিল, প্রহর কাটিল, কত নক্ষত্র অস্ত গেল। সম্মুখে শুকতারা বিস্ময়াবিষ্ট জ্যোতিষ্মান চক্ষুর মত জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

দিগন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে প্রভাত হইল; তখন বল্‌গার ইঙ্গিত পাইয়া অশ্বযুগল থামিল। কুমারী তন্দ্রা মুখের নীল ঊর্ণা সরাইয়া পাশে অশ্বারোহী মূর্ত্তির পানে চাহিলেন। দৃষ্টি বিনিময় হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে একটি তরুণ কন্দর্প। পক্ক দাড়িমের মত তার দেহের বর্ণ। পেশল অথচ পেশীবদ্ধ দেহ, মুখে পৌরুষ ও লাবণ্যের অপূর্ব্ব মেশামেশি। নবজাত গুম্ফের নীচে একটু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমারী তন্দ্রার চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন, এ যে তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর!

সহসা অনুতাপে তন্দ্রার হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি লজ্জা বিজড়িত

কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র, আমার ছলনা ক্ষমা কর। আমি নন্দা নই—আমি তন্দ্রা।'

তরুণ কন্দর্প হাসিলেন, গুম্ফে ঈষৎ তা দিয়া সুধামধুর স্বরে কহিলেন,—'ইসে—সেডা না জাইনাই কি চুরি কৈর্‌রা আন্‌ছি? রাজকুমারী, তুমি বরই চতুরা; কিন্তু আমার চৈক্ষে যদি ধুলাই দিতি পারবা তো তোমারে বিয়া করতি আইলাম কিয়ের লাইগা?'

তন্দ্রা চমকিত হইলেন; বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া স্খলিত স্বরে কহিলেন, 'তুমি—তুমি কে?'

যুবক কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'আরে কচু—সেডা এখনো বোঝবার পার নাই? আমি চন্দ্রানন মাণিক্য—ইসে—প্রাগজ্যোতিষের যুব্‌রাজ। হ—সৈত্য কইলাম।'

* * *

দুইটি অশ্ব অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি মন্থর গমনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পথে ফিরিয়া চলিয়াছে। তন্দ্রার করতল চন্দ্রাননের দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ। তাঁহার স্খলিতবেণী মস্তক মাঝে মাঝে যুব্‌রাজের বাম স্কন্ধের উপর নত হইয়া পরিতেছে।

তন্দ্রা কহিলেন, 'যুবরাজ, কী সুন্দর তোমার ভাষা, যেন মধু ঝ'রে পড়ছে! কত দিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব?'

চন্দ্রানন তন্দ্রার মণিবন্ধে একটি আনন্দ-গদগদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ইসে—আগে বিয়া তো করি, তারপর এক মাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগোর ও কচুর ভাষা এক মাসে ভুইলা যাইতে পারবা না?'

সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা বলিলেন, 'পারমু।'

শালীবাহন

শালীবাহনের আসল নামটা কি ছিল ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ করি ধীরেন সুরেন গোছেরই একটা কিছু হইবে। গত বিশ বছর ধরিয়া ক্রমাগত নিজেকে ঐ নামে সম্বোধিত হইতে শুনিয়া তাহার নিজেরও সম্ভবত পিতৃদত্ত নামটা বিস্মরণ হইয়াছিল।

আশ্চর্য্য নয়। একেবারে ন্যালা-ক্যাবলা না হইলেও শালীবাহনের মত গো-বেচারি সদা-বিকশিত-দন্ত নিরীহ মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের বিরাট বন্ধু-গোষ্ঠীর মধ্যে সকলেই তাহাকে তাচ্ছিল্য-ভরে ভালবাসিতাম। আমাদের উপহাস পরিহাসের সে ছিল পরম সহিষ্ণু লক্ষ্যস্থল।

বছর কুড়ি আগে শালীবাহনের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ করিয়াই সে শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে বেবাক মিশিয়া গেল। প্রায়ই ছোট ছোট শালীদের সঙ্গে লইয়া পার্কে বেড়াইতে যাইত; একটি শালীর বয়স আট-নয় বছর, বাকি দুটি একেবারে কচি। আমাদের মধ্যে কেহ একজন একবার শালীবাহনকে কোঁচার খুঁট দিয়া কচি শালীর নাক মুছাইয়া দিতে দেখিয়া ফেলিয়াছিল; কথাটা তৎক্ষণাৎ বন্ধু সমাজে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং তাহার অনিবার্য্য ফল দাঁড়াইল তাহার শালীবাহন খেতাব।

শালীবাহনের শ্বশুর গুণময় বাবু যে একজন অতি কূটবুদ্ধি লোক ছিলেন তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পরই তিনি জামাতার হাতে সংসার তুলিয়া দিয়া পরম আরামে তামাক টানিতে লাগিলেন। শালীবাহন তখন চাকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, দন্ত বিকশিত করিয়া শ্বশুর ও তাঁহার চারিটি কন্যার ভার গ্রহণ করিল।

এইভাবে বছর পাঁচেক কাটিয়া গেল। শালীবাহন খুশী, গুণময়

বাবু খুশী, শ্যালিকারাও খুশী—এক কথায় সকলেই খুশী—কাহারো মনে কোন দুঃখ নাই। এমন সময় শালীবাহনের জীবনের প্রথম ট্রাজেডি দেখা দিল।

তাহার স্ত্রী সহসা মারা গেল। শালীবাহন একে ভাল মানুষ, তায় পত্নীর বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এই ঘটনায় সে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার দাঁতের হাসি কেমন যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল; রুক্ষ মাথায়, অপরিচ্ছন্ন বেশে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন আমাদের আড্ডায় বসিয়া স্ত্রীর শেষ রোগের কথা বলিতে বলিতে বেচারি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। সুধাংশু আমাদের মধ্যে কুমার-ব্রহ্মচারী, বিবাহ করে নাই; সে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল,—'কি আর করবে শালীবাহন, দুঃখ করে লাভ নাই। কথায় বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে, আর অভাগার ঘোড়া। তুমি দেখে শুনে আর একটি বিবাহ করে ফেল।'

চোখ মুছিয়া শালীবাহন বলিল,—'আর ওসব ভাল লাগে না ভাই;—অফিসে যাই, তাও মনে হয় কার জন্যে—'

শালীবাহনের উদাসীনতা এতদূর গড়াইল যে, সে শালীদের পর্য্যন্ত অবহেলা করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া গুণময় বাবু অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে শালীবাহনের মেজ শালীটি উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গুণময় বাবু তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না, কারণ কন্যার বিবাহ দিবার পক্ষে যে বস্তুটি অপরিহার্য্য তাহা গুণময় বাবুর ছিল না। তিনি কয়েক ছিলিম তামাক পোড়াইয়া শালীবাহনকে সংসারের অনিত্যতা ও সংসারী মানুষের সর্ব্ব অবস্থায় গৃহধর্ম্মপালনরূপ মহাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান-গরিষ্ঠ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

বৎসর ঘুরিবার পূর্ব্বেই মেজশালীর সহিত শালীবাহনের বিবাহ হইয়া গেল।

আবার সকলেই খুশী। শালীবাহনের বিকশিত-দন্তে পূর্ব্বতন হাসি দেখা দিল। বিবাহের বছর খানেকের মধ্যে সে দিব্য মোটা হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের বন্ধু সভার সিদ্ধান্ত হইল, এতদিনে শালীবাহনের গায়ে 'বিয়ের জল' লাগিয়াছে।

তারপর একটি একটি করিয়া বছর কাটিয়া চলিল। পিছু ফিরিয়া তাকাইবার সময় নাই, আশে পাশে তাকাইবারও সময় কম—স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। যে-স্রোতে প্রথম যৌবনে খেলাছলে সাঁতার কাটিয়া স্রোত তোলপাড় করিতাম, তাহাতে নাকানি-চোবানি খাইতেছি, কখন বা অতি কষ্টে নাক জাগাইয়া রাখিয়াছি। বন্ধু গোষ্ঠীর অনেকেই কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। দশ বছর আগে যাহারা হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল, আজ তাহারা কোথায়?

শালীবাহন কিন্তু বিপুল বিক্রমে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। তাহার গণ্ড আরো স্ফীত হইয়াছে, হাসি আর প্রসারিত হওয়া অসম্ভব তাই পূর্ব্ববৎ আছে। দশ বছর তাহার মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কিন্তু যে নিয়মে গাছের কাঁচা ফল পাকে, সেই নিয়মে তাহার কচি শালী দুটিও পাকিয়া উঠিয়াছে। শালীবাহন চাকুরী করিয়া যে টাকা উপার্জ্জন করে তাহাতে শ্বশুর পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে, কিন্তু শালীদের সুপাত্রে ন্যস্ত করা চলে না। তাহারা লব্ধোদয়া চান্দ্র-মসী লেখার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা হইতে লাগিল।

অনূঢ়া কন্যা দুটির বয়স যখন যথাক্রমে উনিশ এবং কুড়ি, সেই সময় কূটবুদ্ধি গুণময় বাবু একটা মস্ত চাল চালিলেন। তিনি হঠাৎ শালীবাহনকে কোনরূপ নোটিস্ না দিয়া মরিয়া গেলেন।

শালীবাহনের জীবনের ইহা দ্বিতীয় ট্রাজেডি। শালী দুটি তাহার ঘাড়ে ত ছিলই, এখন আরো চাপিয়া বসিল।

শালীদের বিবাহ দিবার দায়িত্ব যতদিন শ্বশুরের সঙ্গে ভাগাভাগি ছিল ততদিন শালীবাহন বিশেষ গা করে নাই। কিন্তু এখন সে

উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল ; দন্ত-বিকাশ করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল। আমাদের বন্ধু নলিনাক্ষ সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছিল, তাহার বাড়ীতে গিয়া ধর্ণা দিল ; আমার বাড়ীতেও ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। আমার একটি অবিবাহিত ছোট ভাই আছে, লক্ষ্য তাহার উপর।

কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। শালীবাহনের শালীদের বিনা পারিশ্রমিকে তাহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া নিজ স্কন্ধে বহন করিতে কেহ রাজী নয়। শালীবাহনের হাসি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল ; তাহার গোঁপের চুল দু'একটা পাকিয়া গেল। বুঝিলাম, সংসারস্রোত এতদিনে তাহাকেও কাবু করিয়া আনিয়াছে।

একদিন আমার বৈঠকখানায় তাহাকে কিছু সদুপদেশ দিলাম,—

'ছাখ শালীবাহন, ও সব ধান্ধা ছেড়ে দাও। টাকা থাকলে, মেয়ে না থাকলেও তার বিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মেয়ে থাকলে—আর টাকা না থাকলে বিয়ে দেওয়া যায় না। এই সহজ কথাটা বুঝে নাও। আজ কাল কত মাইনে পাচ্ছ ?'

'পঁচাত্তর।'

'হুঁ। কিছু বাঁচিয়েছ ?'

'কোত্থেকে বাঁচাব ভাই। খেতে পরতেই কুলোয় না, তার উপর বাড়ি ভাড়া আছে। শ্বশুর যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি তবু সতেরো টাকা করে পেন্সন পেতেন, কিন্তু এখন—, আমরা চারটি প্রাণী, আর সম্বলের মধ্যে ঐ পঁচাত্তর টাকা। ভাগ্যে ছেলেপুলে হয়নি তাই কোন রকমে চলে যাচ্চে। বুঝতেই ত পারছ।'

'বুঝেছি। বিয়ে দেবার আশা ছেড়ে দাও ; তোমার শালীরা এমন কিছু সুন্দরী নয় যে বিনা পণে কেউ নেবে। আজকাল অনেক মেয়ে-স্কুল হয়েছে, দেখেশুনে তাইতে মাষ্টারণী করে দাও।'

'কিন্তু ভাই লেখাপড়াও ত এমন কিছু শেখেনি যে স্কুলে শেখাতে

পারে। রামায়ণটা মহাভারতটা পড়তে পারে এই পর্য্যন্ত বিদ্যে; কি করি বল।' বলিয়া অসহায়ভাবে আমার পানে তাকাইয়া রহিল।

বড় বিরক্তি বোধ হইল, অধীরভাবে বলিলাম,—'তবে আর কি করবে, শালী দুটিকে কাঁধে করে নিয়ে বসে থাক। বিয়ে ওদের হবে না, আমি লিখে পড়ে দিলুম। আর আমার ভায়ের কথা যে বলছ, জানো ত সে ভাল ছেলে, য়ুনিভার্সিটিতে ভাল রেজাল্ট্ করেছে। তার ইচ্ছে বিলেত যায়; কিন্তু আমার এমন টাকা নেই যে তাকে বিলেত পাঠাই। শ্বশুরের পয়সায় সে যাতে বিলেত যেতে পারে সে চেষ্টা আমার করা উচিত নয় কি? তুমিই বল।'

শালীবাহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর পাংশু হাসিয়া বলিল,—'হ্যাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা ভাই, আজ তাহলে উঠি।' বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তারপর মাসছয়েক আর তাহার দেখা পাইলাম না। খবর পাইতাম সে এখনো আশা ছাড়ে নাই, এখানে ওখানে শালীদের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

এইবার শালীবাহনের জীবনের তৃতীয় ট্রাজেডি। একদিন শুনিলাম, তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিও মারা গিয়াছে। তাহার জন্য মনে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। পৃথিবীতে যে যত ভালমানুষ, শাস্তি কি তাহাকেই সব চেয়ে বেশী সহিতে হয়? সেদিন তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম স্মরণ করিয়া একটু অনুতাপও হইল।

তারপর আরও বছরখানেক কাটিয়া গেল। শালীবাহনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই; তাহার খবরও পাই না। পুরাতন পরিচিতদের সংসর্গে সে আর আসে না; নলিনাক্ষের আশাও ছাড়িয়াছে।

অবশেষে পূজার সময় কলেজ ষ্ট্রীটের একটা বড় কাপড়ের দোকানে হঠাৎ শালীবাহনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, তাহার মুখে সেই পুরাতন বিকশিত-দন্ত হাসি ফিরিয়া

আসিয়াছে। সানন্দে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম,—'আরে শালীবাহন! কেমন আছ?'

শালীবাহন এক জোড়া সস্তা সিল্কের জংলা শাড়ী দেখিতেছিল, সরাইয়া রাখিয়া হাসি মুখে বলিল,—'ভাল আছি ভাই।'

'তারপর, তোমার শালীদের খবর কি? বিয়ে হল?'

সলজ্জভাবে শালীবাহন বলিল,—'হ্যাঁ ভাই, হয়েছে। মানে—আমিই তাদের বিয়ে করেছি।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

'বল কি! দু'জনকেই?'

'হ্যাঁ ভাই, দু'জনকেই। কি করি বল, কোথায় ফেলি ওদের? পয়সা নেই, পাত্র ত আর পেলুম না। স্ত্রীও মারা গেলেন। তাই শেষ পর্য্যন্ত—'

আমি আবার তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া বলিলাম,—'খাসা করেছ। বাহাদুর লোক বটে তুমি।'

শালীবাহন স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল। আমি বলিলাম,—'যাক, মোটের উপর ভালই আছ তাহলে! অন্তত শালী-দায় থেকে ত উদ্ধার পেয়েছ। তা তোমার শালীরা কোন আপত্তি করলে না? আজকালকার মেয়ে—'

শালীবাহন বলিল,—'না, আপত্তি করেনি। আর করলেই বা উপায় কি ছিল বল। স্ত্রী মারা গেলেন; বাড়ীতে আর দ্বিতীয় লোক নেই—আমি আর ওরা। ভাল দেখায় না—ওরা সোমত্ত হয়েছে, বুঝলে না? কাজেই—'

আমি সজোরে হাসিয়া উঠিলাম—'তা বটে। যাক, শ্বশুর-কন্যার কোনটিকেই বাদ দিলে না। সাবাস শালীবাহন!'

শালীবাহন চোখ টিপিয়া খাটো গলায় বলিল—'আস্তে! ওরা রয়েছে।'

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। অদূরে দাঁড়াইয়া দুইটি যুবতী কাপড়

পছন্দ করিতেছিল—লক্ষ্য করি নাই; এখন একযোগে তীক্ষ্ণ তীব্র-দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া আছে। থতমত খাইয়া গেলাম। শালীবাহন স্ত্রীদের লইয়া পূজার বাজার করিতে আসিয়াছে! লজ্জায় অস্পষ্টস্বরে শালীবাহনকে আমার বাড়ীতে একদিন যাইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

পথে যাইতে যাইতে যুবতী দুটির চোখের সেই দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ভর্ৎসনা আর অভিমান! সত্যই ত, এ লইয়া হাসি তামাসা করিবার আমার কি অধিকার আছে? মনে হইতে লাগিল, ঐ ভর্ৎসনা আর অভিমানের সমস্তটাই আমার প্রাপ্য।

কিন্তু সে যাই হোক, শালীবাহনের শালী দুটী দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়। শালীবাহনকে ভাগ্যবান পুরুষ বলিতে হইবে।

অমরবৃন্দ

গৃহিণী থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। কাজেই শুইতে যাইবার বিশেষ তাড়া ছিল না। রাত্রি দশটা নাগাদ আহারাদি শেষ করিয়া লাইব্রেরী-ঘরে আসিয়া বসিলাম। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল।

নৈশ-প্রদীপের তৈল পুড়াইয়া কাজ করা আমার অভ্যাস নাই—ভারি ঘুম পায়! কিন্তু আজ স্থির করিলাম—গৃহিণী যখন বারোটার পূর্ব্বে ফিরিবেন না—তখন মাঝের এই দুই ঘণ্টা সময় কাজ করিয়াই কাটাইয়া দিব। 'বাংলা সাহিত্যের অমরবৃন্দ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিব মনে আঁচিয়া রাখিয়াছিলাম; সম্পাদক মহাশয়ও প্রত্যহ তাগাদা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন কি শীঘ্র লেখাটা না দিলে তিনি আমার বাসায় আসিয়া আড্ডা গাড়িবেন, এমন ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু কিছুতেই লেখাটা বাহির হইতেছিল না।

আজ স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হোক প্রবন্ধের পত্তন করিব। একবার আরম্ভ করিতে পারিলে আর ভয় নাই।

টেবিলের সামনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বসিলাম। সম্মুখে টেব্‌ল-সংলগ্ন মেহগ্নির র‍্যাকের উপর, বাংলাভাষায় যে কয়খানি অমর গ্রন্থ আছে সারি দিয়া সাজানো ছিল—সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলাম।

প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ধরা যাক। মধুসূদনের অমর সৃষ্টি কোন্ চরিত্র? রাবণ নিশ্চয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাবণকে লইয়াই প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; মন্দ হইবে না।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কোন্ সৃষ্টি অমর? কপালকুণ্ডলা? দেবী? সূর্য্যমুখী? ভ্রমর?—কি আশ্চর্য্য! বঙ্কিম কি পুরুষ-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই? তবে, কেবল নারীচরিত্রগুলি মনে পড়িতেছে কেন?

যাক্—এবার রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কে কে আছে? চিত্রাঙ্গদা—'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী'। আর? রাজা বিক্রম! হুঁ—হইতেও পারে! তা ছাড়া চোখের বালির বিনোদিনী আছে—সন্দীপ আছে—

রবীন্দ্রনাথের পর কে? শরৎচন্দ্র। তাঁর রাজলক্ষ্মী, কমল, সুরেশ, সব্যসাচী, কিরণময়ী—

অতঃপর? শরৎচন্দ্রের পর কে? আর কেহ আছে কি!··· টেবিলের ধারে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে—

আমি আফিমের নেশা করি না। কিন্তু তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে চিরদিনের অভ্যাস মিশিয়া বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি মানস-চক্ষে দেখিলাম—আমার সবুজ বনাত-ঢাকা টেব্‌লের উপর কচি কচি ঘাস গজাইয়াছে। শাখাযুক্ত কলমদানীটা কোন্ ফাঁকে তুটি নব পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে যে বই খাতা ইত্যাদি ছড়ানো ছিল, সেগুলা পাথরের চ্যাঙড় মাটির ঢিবি বনিয়া

গিয়াছে। গঁদের পাত্রটা বেবাক শিবমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অথচ আয়তনে কিছুই বাড়ে নাই,—আমি যেন বাইন-কুলারের উল্টা মুখ দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি।

বড় ভাবনা হইল। আমার লেখার সমস্ত সরঞ্জাম যদি এইভাবে পাহাড় জঙ্গল বৃক্ষ ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয়কে কি দিয়া ঠেকাইয়া রাখিব? রচনার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বাঘাস তিনি কখনই লইবেন না, তিনি তেমন লোকই নয়।

টেব্‌লের ওপারে বইয়ের র‍্যাক্‌টা ধোঁয়াটে একটা পাহাড়ের মত দেখাইতেছিল। পাশাশাশি বিভিন্ন আয়তনের বইগুলা তাহারি উত্তুঙ্গ চূড়ার মত আকাশে মাথা তুলিয়াছিল। হঠাৎ খুট্ খুট্ শব্দ শুনিয়া ভাল করিয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—দুইজন ঘোড়্‌সওয়ার একটা বইয়ের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে! পাহাড়ী রোমশ দুইটি ঘোড়ার পিঠে কম্বলের জিন্, তাহার উপর দুই সিপাহী আসীন। একজন হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। হিন্দুর মাথায় মুরেঠা, গায়ে আঙ্‌রাখা, পায়ে নাগরা, কোমরে তরবারি। মুসলমানের মাথায় টোপ, গায়ে কিংখাপের শিরমানি ও পায়জামা, পায়ে মখমলের জুতা। তাহারও রেশমী কোমরবন্দ্‌ হইতে শম্‌শের ঝুলিতেছে।

দুজনে আসিয়া আমার কলমদানের একটা বৃক্ষতলে নামিল। গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া হিন্দু বলিল—'খাঁ সাহেব, এইখানেই কোথায় আছে। আমার মনে আছে আমি পাহাড়ের গুহা থেকে সেটা ছুঁড়ে নীচের উপত্যকায় ফেলে দিয়েছিলুম।'

খাঁ সাহেবের চেহারা অতি সুন্দর; মুখে সামান্য দাড়ি আছে, কিন্তু তাহাতে গণ্ড ও চিবুকের গোলাপী বর্ণ ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহার চোখের দৃষ্টি মেঘলা আকাশের মত ছায়াচ্ছন্ন—যেন দুঃখের গভীরতম তল পর্য্যন্ত ডুব দিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'তাই ত সিংহজী, এতদিন পরে সে-জিনিষ কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? যা হোক, চেষ্টা করে দেখতে

দোষ নেই। হয় ত ঘাসের তলায় চাপা পড়ে গেছে।—আসুন খুঁড়ে দেখা যাক।' বলিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিলেন।

সিংহজী হাসিয়া বলিলেন,—'তলোয়ার রাখুন। সব কাজ কি তলোয়ারে হয়? আমি খোন্তা জোগাড় করছি।' এই বলিয়া সিংহজী আমার একটা কলম তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—'চমৎকার খোন্তা পাওয়া গেছে। আপনিও একটা নিন্।'

দু'জনে অম্লান বদনে আমার দুইটি কলম তুলিয়া লইয়া ঘাসের উপর এখানে-ওখানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম—কে ইহারা? কোথায় ইহাদের কথা পড়িয়াছি। একজনের মুখে শৃগালের ধূর্ত্ততা মাখানো, অন্যজন শার্দ্দুলের মত গম্ভীর। অথচ দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। কে ইহারা?

সিংহজী সহসা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন,—'পেয়েছি, পেয়েছি, খাঁ সাহেব। এই দেখুন,'—বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বস্তু তুলিয়া ধরিলেন।

খাঁ সাহেব নিকটে আসিয়া বলিলেন,—'সত্যিই ত! লাগিয়ে দেখুন আপনারটা বটে কিনা।'

সিংহজী বলিলেন,—'আমি আমার আঙ্গুল চিনি না?' বলিয়া নিজে বাঁ হাতটা তুলিয়া ধরিলেন। তখন দেখিলাম তাঁহার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা নাই। সিংহজী ছিন্ন আঙুল যথাস্থানে জুড়িয়া দিতেই সেটা বেবাক জোড়া লাগিয়া গেল।

এতক্ষণে ইহাদের চিনিলাম—আঙুলকাটা মাণিকলাল ও মবারক আলি খাঁ!

মবারক বলিলেন,—'সিংহজী, আপনার হারানো নিধি ত আপনি খুঁজে পেলেন। এবার চলুন আমার হারানো নিধির সন্ধান করি।'

মাণিকলাল মিটি মিটি হাসিয়া বলিলেন,—'কে, দরিয়া বিবি?'

মবারক কিয়ৎকাল অধোমুখে রহিলেন, শেষে বলিলেন,—'সিংহজী, আপনি ত সব কথাই জানেন। যে আমাকে সাপের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'শাহজাদি আলম্ জেব-উন্নিসা বেগম ?'

'হ্যাঁ, তাকে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলুম, আবার হারিয়েছি।'

মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাঁকে খুঁজলেই পাবেন মনে হয় ?'

মবারক বলিলেন,—'জানি না। কিন্তু তবু খুঁজতে হবে।'

'বেশ—চলুন।'

দুইজন ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে পশ্চাতের পাহাড় হইতে পিল্ পিল্ করিয়া উইয়ের মত এক পাল ভেড়া বাহির হইয়া আসিল। গড্ডালিকা-প্রবাহের পশ্চাতে একজন মেষ-পালক। তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। মেষ-পালক বয়সে প্রৌঢ়; দাড়ি গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, স্কন্ধে উপবীত। মুখে একটু ব্যঙ্গ-হাস্য লাগিয়া আছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত ধাপ্পাবাজী তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

মেষ-যূথ সবুজ মাঠের উপর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মেষ-পালক অনায়াস-পদে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তারপর একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শ্যামল শষ্পশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক মন্দিরের চত্বরে পা তুলিয়া দিলেন।

মাণিকলাল এতক্ষণ অশ্বের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন; বলিলেন,—'লোকটা ত মহা পাষণ্ড। শিবমন্দিরে পা তুলে দিলে! অথচ ব্রাহ্মণ বলে বোধ হচ্চে। আসুন ত দেখি!' মেষ-পালকের নিকটে গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—'কে রে তুই—শিবমন্দিরের গায়ে পা তুলে দিয়েছিস! পা নামা ব্যাটা।'

মেষ-পালক পা নামাইয়া উঠিয়া বসিল। দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'তোমাদের সঙ্গে তরবারি রহিয়াছে দেখিতেছি। দুই জনেই বলবান। সুতরাং আমার অন্যায় হইয়াছে, এরূপ কার্য্য আর করিব না।'

মাণিকলাল কহিলেন,—'তুমি ব্রাহ্মণ বলেই আজ নিষ্কৃতি পেলে। কিন্তু এ-রকম ভাবে পা উঁচু করে শোবার উদ্দেশ্য কি?'

মেষ-পালক বলিল,—'পা উঁচু করিয়া শুইলে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়। চেষ্টা করিয়া দেখিও।'

মাণিকলাল এই অদ্ভুত মেষ-পালকের কথা শুনিরা বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—'তোমার নাম কি?'

মেষ-পালক মৃদুহাস্যে বলিল,—'আমার নাম জাবালি। উপবেশন কর।'

মাণিকলাল তখন দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। মবারকও পাশে বসিলেন।

মাণিকলাল সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্রভু, আপনি ভেড়া চরাচ্ছেন কেন?'

জাবালি বলিলেন,—'দেখ, ভেড়ার মাংস অতিশয় সুস্বাদু। তাহাদের প্রতিপালনে কোনও কষ্ট নাই। তাহারা আপনি চরিয়া খায়, আপনি বংশবৃদ্ধি করে। আমি বিনা ক্লেশে উহাদের মাংস পাইয়া থাকি। উপরন্তু উহাদের রোম হইতে কম্বল প্রস্তুত হয়। সুতরাং অন্নবস্ত্র কিছুরই অভাব থাকে না।'

মবারক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'অন্ন-বস্ত্র ছাড়া মানুষের অন্য কাম্য কি নেই?'

জাবালি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন,—'আর কি আছে?'

মবারক একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন,—'রমণীর প্রেম।'

জাবালি বলিলেন,—'বৎস, প্রেম একটা সংস্কার মাত্র—অতএব অন্যান্য সংস্কারের মত উহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু ক্ষুধা সংস্কার নয়—শীতের প্রকোপকেও সংস্কার বলা চলে না। উহারা সংস্কার-বিবর্জ্জিত উলঙ্গ সত্য—চোখ ঠারিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জগতে আর যাহা কিছু সকলই সংস্কার। দেখ কিছুকাল পূর্ব্বে, আমি শিবমন্দিরে পা তুলিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া তোমরা আমাকে তিরস্কার

করিতেছিলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, শিব কে? তাহার আবার মন্দির কিসের? ইহা যদি শিবের মন্দির হয়, তবে শিব নামক কোনো ব্যক্তি নিশ্চয় ইহার মধ্যে আছে। আমি আদেশ করিতেছি, আনো দেখি শিবকে এই মন্দির হইতে বাহির করিয়া।'

মাণিকলাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তখন জাবালি আবার বলিলেন,—'শিব এখানে নাই, সুতরাং ইহা শিবমন্দির নহে। অতএব ইহার গায়ে পা তুলিয়া দিলেও কোনো অপরাধ হয় না। কিন্তু তোমরা দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ যখন আপত্তি করিতেছ, তখন সুবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া আমি সে-কার্য্য হইতে বিরত হইলাম।'

মবারক পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,—'কিন্তু নারীর প্রেম একটা সংস্কার মাত্র, এ যুক্তি কি সুবুদ্ধি-পরিচালিত?'

জাবালি কহিলেন,—'অবশ্য। শারীরিক ক্ষুধার তাড়নাই পুরুষকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে; এই আকর্ষণ নারী-বিশেষের প্রতি নয়—নারী-সাধারণের প্রতি। ক্ষুধার সময় মৃগমাংস ও মেষমাংস যেরূপ সমান প্রেয়—নারী সম্বন্ধেও তাহাই, কোনও প্রভেদ নাই। কেবল, সুস্বাদু খাদ্য দেখিয়া যেরূপ লোকে লুব্ধ হয়, সুন্দরী নারী দেখিয়াও সেইরূপ লালায়িত হয়। এই লালসাকে প্রেম বলিতে চাহ বলিতে পার, কিন্তু তাহা ভ্রম। বস্তুত, প্রেম বলিয়া কিছু নাই, মানুষ বংশানুক্রমে আত্মপ্রতারণা করিয়া এই প্রেমরূপ সংস্কারের উদ্ভব করিয়াছে।—ভাবিয়া দেখ, তুমি যতদিন জেব্-উন্নিসাকে না পাইয়াছিলে ততদিন দরিয়া বিবিকে লইয়া সন্তুষ্ট ছিলে; কিন্তু জেব্-উন্নিসাকে পাইবামাত্র দরিয়া বিবির প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মিল। ইহার কারণ কি?'

মবারক দ্বিধা প্রতিফলিত মুখে নীরব রহিলেন, সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। মাণিকলাল বলিলেন,—'প্রভু, আপনার কথাগুলি কড়া হলেও সত্য বলে মনে হচ্চে। নির্ম্মল থাকলে আপনার উপযুক্ত জবাব দিতে পারত। সে ভারি বুদ্ধিমতী—ঔরংজেব বাদশাকে ঘোল

খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনি স্বয়ং সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন ত?'

জাবালি বিনয় সহকারে বলিলেন,—'দম্ভ করিতে নাই। দম্ভে বুদ্ধির মলিনতা জন্মে। তথাপি, আমি সম্পূর্ণ দম্ভমুক্ত হইয়া বলিতেছি যে আমার সংস্কার দূর হইয়াছে।'

মবারক ঈষৎ অধীরভাবে বলিলেন,—'সাহেব, আপনার বক্তব্য আমার কাছে খুব স্পষ্ট হল না। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি লোক পৃথিবীর শতকোটি নারীর মধ্যে কেবল একটিকেই সারাজীবন ভালবেসেছে—অন্য স্ত্রীলোকের পানে মুখ তুলেও চায়নি; সেই স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে জগৎ অন্ধকার দেখেছে; কিন্তু তবু অন্য নারীকে হৃদয় সমর্পণ করতে পারেনি। এই একনিষ্ঠা কি প্রেম নয়?'

জাবালি বলিলেন,—'বৎস, উহাই প্রেম নামে অভিহিত বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা একটি সংস্কার মাত্র। সংস্কার মাত্রেই দুঃখের কারণ, তাই প্রেম-পীড়িত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা দুঃখ পায়। দেখ, ছাগজাতীয় জীব প্রেম নামক সংস্কার হইতে মুক্ত—তাই তাদের প্রেমজনিত দুঃখ নাই; বিশেষের প্রতি তাহার নিষ্ঠা নাই, তাই তাহার অনুরাগ সর্ব্ববাপী। তাহাকে বিশ্বপ্রেমিকও বলিতে পার। এই ছাগের অবস্থাই সকল মোক্ষাভিলাষীর কাম্য। উহাই ভূমা।'

মবারক বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, জাবালির কথার উত্তর দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এইখানেই বোধ করি আলোচনা শেষ হইত, কিন্তু এই সময় মন্দিরের অপর পার্শ্বে দুইজন তর্করত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে দুইজন ধুতি-পাঞ্জাবী-পরিহিত যুবক মন্দিরের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পুরুষ, খদ্দরের বেশভূষা যেন তাহার বিশাল অঙ্গে ঠিক মানাইতেছে না; অন্যটি পরিপূর্ণ বাঙালী, শ্যামল সুশ্রী চেহারা, মুখ বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল।

রজতগিরিনিভ পুরুষ জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল,—'তুমি ভুল করছ

বিনয়। আমার হাতে যখন অস্ত্র নেই তখন আমি শুধু-হাতেই লড়ব —কিন্তু তবু দুষ্টের পীড়ন চুপ করে পড়ে সহ্য করব না। আমি গোরার গুলি খেয়ে মরতে রাজি আছি, কিন্তু পাহারাওয়ালার রুলের গুঁতো আমার অসহ্য।'

বিনয় বলিল,—'বড়টা যখন তুমি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত, তখন অপেক্ষাকৃত ছোটটায় আপত্তি কেন ?'

গোরা বলিল,—'আবার ভুল করলে। আমার কাছে বন্দুকের গুলিটা তুচ্ছ, রুলের গুঁতোই বড়। কারণ ওতে আমার মনুষ্যত্বকে আহত করে, বন্দুকের গুলি তা পারে না।'

বিনয় বলিল,—'তা যেন হল। কিন্তু এদিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধি যাতে হয় সেদিকেও ত দৃষ্টি রাখা দরকার।'

'উদ্দেশ্যটা তোমার কি শুনি ?'

'দেশের উদ্ধার।'

গোরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—'না—কখনো না। আমাদের প্রথম এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্চে মনুষ্যত্বের উদ্ধার। মনুষ্যত্বকে যদি ভীরুতার হাত থেকে উদ্ধার করতে না পার, তাহলে দেশ নিয়ে করবে কি ? সত্যাগ্রহ ! তুমি কি মনে কর, নিজের দাবীকে আঁকড়ে ধরে এক জায়গায় বসে থাকলেই সত্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয় ?'

বিনয় বলিল,—'তাছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় আর কি করা যেতে পারে ? তোমার মতন গর্জ্জন করলে কোনো ফল হবে কি ?'

'না, শুধু গর্জ্জনে কাজ হবে না, বর্ষণও চাই। আমাদের দেহ আছে, হাত পা আছে, সেই হাত পা দিয়েই কাজ করতে হবে। অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে যুযুৎসু করে তুলতে হবে। কেবল প্রহার সহ্য করবার শক্তিকে পোক্ত করে তুললে কাজ হবে না। ওটা জড়শক্তি—জীবশক্তি নয়।'

এই সময়ে মন্দির পার্শ্বে কয়েকজন লোক আসীন দেখিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল,—'গোরা, তোমার বক্তৃতা থামাও—কারা রয়েছে।'

জাবালি হাত তুলিয়া উভয়কে নিকটে ডাকিলেন। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে কহিলেন,—'স্বাগত! তোমরা উপবিষ্ট হও।'

গোরা ও বিনয় সসম্ভ্রমে ঋষিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। জাবালি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের মধ্যে কিসের বচসা হইতেছিল?'

বিনয় অল্প কথায় ঋষিকে তর্কের বিষয় বুঝাইয়া দিল। তিনি বলিলেন,—'ভাল, বুঝিলাম, তোমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাও। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের কী ইষ্টসিদ্ধি হইবে?'

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিল,—'একেবারে গোড়ার প্রশ্ন। গোরা, জবাব দাও।'

গোরা বলিল,—'স্বাধীনতাই চরম ইষ্ট নয়, ইষ্টসিদ্ধির একটা উপায় মাত্র। আসল কাম্য—সুখ।'

জাবালি বলিলেন,—'যদি তাহাই হয় তবে সুখ লাভের জন্য দুঃখকে বরণ করিতে চাহ কেন?'

গোরা বলিল,—'বৃহত্তর দুঃখের হাত এড়াবার জন্য; যেমন গো-বীজের টীকা নিলে বসন্ত রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।'

মাণিকলাল গোরাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, 'ঠিক কথা। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; যেমন, ক্ষুধার বৃহত্তর দুঃখ এড়াবার জন্য ঋষিবর মেষ পালনরূপ অল্প দুঃখ স্বীকার করছেন।'

জাবালি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভাল। তোমাদের যুক্তি বিচার-যোগ্য বটে। এখন বল দেখি, ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ডকে বা তদ্দেশবাসী নরনারীকে স্বাধীন করিয়া তোমাদের লাভ কি হইবে? তোমরা নিজের চরকায় তৈল দিতেছ না কেন?'

গোরা বলিল,—'ভারতবর্ষ আমার চরকা, আমি তাতেই তেল দিতে চাই। ভারতবর্ষের ছত্রিশকোটি নর-নারীর সুখই আমার সুখ।'

জাবালি কিয়ৎকাল তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়া রহিলেন, তারপর

ধীরে ধীরে শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিলেন, 'বৎস, তুমি পরের প্রতি মমতাসম্পন্ন হইয়া ভ্রান্তপথে চলিয়াছ—ওপথে কাম্যলাভ করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষই বল আর অন্য দেশই বল, উহা কতকগুলি মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র। এই মনুষ্যগুলি নিজের সুবিধার জন্য কতকগুলি সমাজ বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছে। সকল সমাজের কাম্য এক নহে—এমন কি পরস্পর বিরোধী। একে যাহা চাহে, অন্যে তাহা চাহে না। ব্যক্তিগত ভাবেও তদ্রূপ;—তুমি সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহ, আর একজন মদ্য মাংস আহার করিয়া তামসিক ভাবে কাল হরণ করিতে ভালবাসে। সুতরাং কেবলমাত্র স্বাধীনতার দ্বারা সকলকে একই কালে সুখী করা অসম্ভব। সে চেষ্টাও পণ্ডশ্রম।'

কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিয়া গোরা বলিল,—'তবে, আপনার মতে, সার্ব্বজনীন সুখ লাভের উপায় কি?'

জাবালি বলিলেন, 'আত্মসুখের চিন্তায় অবহিত হওয়া। সকলেই যদি স্বার্থসন্ধ হইয়া নিজ নিজ সুখের কথা ভাবিতে থাকে তাহা হইলে অচিরাৎ তাহারা সুখবস্তু লাভ করিবে। দেখ, কি সহজ উপায়। সকলে স্বার্থপর হও, আর কাহারও দুঃখ থাকিবে না।'

বিনয় ও মাণিকলাল হাসিতে লাগিলেন। গোরার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল, সে বলিল,—'প্রস্তাবটা বোধ হয় নূতন নয়—আগেও শুনেছি। কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে যখন সঙ্ঘাত বাধবে তখন ত দুঃখ আপনি এসে পড়বে!'

জাবালি বলিলেন,—'সত্য। মনুষ্যজীবনের চরম প্রেয় কি তাহা মানুষ জানে না বলিয়াই যত প্রকার দুঃখের উদ্ভব হয়। কেহ মনে করে অর্থই সুখ, কেহ মনে করে স্বাধীনতাই সুখ। এইজন্য লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্নতা হেতু বিরোধের উৎপত্তি হয়। তুমি ভারতবর্ষকে সুখী করিতে সমুৎসুক। উত্তম কথা, যাহা বলিতেছি শোন। লোকশিক্ষা দাও। মানুষকে বুঝাও যে, সংস্কার বিমুক্ত হইয়া সুখের অন্বেষণই একমাত্র ইষ্ট। সুখ কি তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে—

তাহাকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দাও। যেদিন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবে সুখ নামক মানসিক অবস্থাই একমাত্র পরমার্থ—ঐহিক বিষয়-সম্পত্তি বা দারা-পরিজন নহে—সেদিন জগতে আর দুঃখ থাকিবে না।'

মবারক এতক্ষণ নীরবে বসিয়া শুনিতেছিলেন; তিনি প্রশ্ন করিলেন,—'কিন্তু সুখ কাকে বলে সেটা ত আগে জানা দরকার। সুখের সংজ্ঞা কি?'

জাবালি হাসিলেন, বলিলেন,—'দুঃখ-সংযোগের বিয়োগই সুখ। ইহার অধিক কিছু বলিব না। গীতা নামক একটি গ্রন্থ আছে—উহাতে কিছু কিছু সত্য কথা বলা হইয়াছে; পাঠ করিয়া দেখিতে পার। শুনিয়াছি, আকবর শাহ উহা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।'

সহসা দূরে রমণী কণ্ঠের আর্ত্তধ্বনি ইঁহাদের আলোচনার জাল ছিন্ন করিয়া দিল। সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, একটি যুবতী ভয়-ব্যাকুল ভাবে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং দুইজন মাতাল পরস্পর গলা-জড়াজড়ি করিয়া স্খলিতপদে টলিতে টলিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

একটা মাতাল ভাঙা গলায় গান ধরিল,—'এসেছিল বক্না গরু পর গোয়ালে জাব্না খেতে—'

দ্বিতীয় মাতাল বলিল,—'If music be the food of love, play on—The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds—'

পলায়মানা যুবতী আবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিল,—'বাঁচাও—কে আছ রক্ষে কর—'

গোরা, বিনয়, মবারক ও মাণিকলাল একসঙ্গে উঠিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন; গোরা জিজ্ঞাসা করিল,—'কি হয়েছে?'

স্ত্রীলোকটি তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—'ওরা আমার পেছু নিয়েছে। আমি অভয়া।'

মাতাল দুটাও কিছু দূরে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুদ্ধ মবারক তরবারি বাহির করিয়া তাহাদের কাটিতে উদ্যত হইলেন। মাণিকলাল ইসারায় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোরা কারা?'

এক নম্বর মাতাল তখনো ভাঙা গলায় গান গাহিতেছিল, সে গান বন্ধ করিল না। দ্বিতীয় মাতাল বলিল,—'কেন বাবা বদিয়াতি করছ—শিকার পালায়, পথ ছাড়ো। আমরা দু'জনে নামকাটা সেপাই।'

মাণিকলাল তাহার নাসিকায় একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; গোরা তাহার সঙ্গীতজ্ঞ সহচরের গালে একটি প্রচণ্ড চড় কশাইয়া দিল। দু'জনেই ধরাশায়ী হইল। দ্বিতীয় মাতালটা শয়ান অবস্থাতেই মাথা তুলিয়া বলিল, 'এই ত বাবা অন্যায় করছ। মাতাল মেরে কোনো লাভ নেই—তার চেয়ে মদ মারো. মজা পাবে। গোকুলবাবুকে ঐ কথাই বলেছিলুম—'

প্রথম মাতাল ক্ষীণকণ্ঠে গান ধরিল,—'দেহি পদপল্লব মুদারম্—'

মবারক তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি পদাঘাত করিলেন; সে একবার হেঁচ্‌কি তুলিয়া নীরব হইল।

এই সময় জাবালি সেখানে আসিয়া মাতাল দুইটিকে শায়িত অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন,—'কি হইয়াছে? ইহারা মদ্যপ দেখিতেছি। আহা, উহাদের মারিও না, ছাড়িয়া দাও।'

দ্বিতীয় মাতাল একটা হাত তুলিয়া বলিল,—'A men! বেঁচে থাক বাবাজী—তোমার দাড়ির জয়জয়কার হোক। কিন্তু বাবা, মদ্যপ বল্‌লে প্রাণে বড় ব্যথা পাব। দেবেটা পাতি মাতাল কিন্তু বাবা, আমি—সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে—'

দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'নিমে চুপ কর, গানটা গাইতে দে—' বলিয়া গান গাহিবার উদ্যোগ করিল—'সুরাপান করি না আমি—'

নিমচাঁদ বাধা দিয়া বলিল,—'তুই শালা রামপ্রসাদের কি জানিস? ক্যাডাভারাস্ চাষা কোথাকার। তুই মালিনী মাসীর গান গা—'

গোরা বলিল,—'চোপরও।—অভয়া, এ দুটোকে নিয়ে কি করি বল ত?'

অভয়া এতক্ষণে বেশ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; হাসিয়া বলিল,—'ছেড়ে দিন। আচম্‌কা ভয় পেয়েছিলুম, নইলে ভয় পাওয়া আমার স্বভাব মনে করবেন না যেন, গৌরবাবু। তাছাড়া, মাতালের অভিজ্ঞতাও আমার জীবনে কম হয়নি।'

জাবালি বলিলেন,—'বৎসে অভয়া, তোমার প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কারণ, আমি দেখিতেছি, সুরাসক্ত হইলেও ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কার-মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা বিশেষ করিয়া তোমার দয়ার পাত্র।'

অভয়া ভক্তিভরে জাবালির পদধূলি লইয়া বলিল,—'প্রভু, আপনার বাণীই আমার জীবনের শান্তি। সংস্কার থেকে মুক্তি কখনো পাব কিনা জানি না, কারণ, দেখতে পাই একটা সংস্কার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত সংস্কারটা ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু সেই পথেই চলেছি!'

জাবালি বলিলেন,—'সেই পথেই চল। উহাই একমাত্র পথ—অন্য পন্থা নাই।'

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'দেবী হিন্দ্রলিনীকে দেখছি না? তিনি কোথায়?'

হিন্দ্রলিনীর নাম শুনিবামাত্র জাবালির মুখে দুঃখের ছায়া পড়িল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বললেন,—'হিন্দ্রলিনী নাই—তিনি স্বর্গতা।' বলিয়াই সচকিতভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'কিন্তু সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নাই। যবচূর্ণ থাসিতে ঈষৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু তাহা যৎসামান্য। আমার মেষপাল লইয়া

আমি পরম সুখে আছি।' বলিয়া বদনমণ্ডল প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিলেন।

মবারক পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন; তিনি মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে, বোধ করি মাতালের গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হইয়াই, অনেকগুলি নরনারী পাহাড়তলি হইতে বাহির হইয়া ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিলাম না, কয়েকজনকে আন্দাজে চিনিলাম। একজন আধ-পাগলা গোছের লোক একটা ভাঙা বেহালা লইয়া অনবরত তাহাতে ছড় চালাইতেছিল কিন্তু বেহালায় আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। মূর্ত্তিমতী ইন্দ্রানীর মত একটি নারী—মুখে গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে—মন্থরপদে আসিতে আসিতে পিছু ফিরিয়া ডাকিল—চারু!

তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। এমন আরও অনেক নরনারী আসিল, কাহাকেও দেখিয়া চিনিলাম, কেহ চেনা-অচেনার সংশয়ময় সন্ধিস্থলে রহিয়া গেল।

দুইটি তরুণী হাত ধরা-ধরি করিয়া নিঃশব্দে সকলের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল, কেহ তাহাদের লক্ষ্য করে নাই। দুজনেই শ্যামবর্ণা কৃশাঙ্গী—চেহারাও প্রায় একই রকম। বিনয়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় বিনয় মুখ তুলিয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিল, বলিল,—'ব্যাপার কি? একেবারে যুগল রূপে যে!'

বুঝিলাম, দু'টিই ললিতা। একটি বিনয়ের, অন্যটি শেখরের।

বিনয়ের ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিল, উত্তর দিল না। গোরার কাছে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল,—'গৌরবাবু, সুচিদিদি আপনাকে ডাকছেন। এদিকে কিসের গোলমাল হচ্ছে—তাই ডেকে পাঠালেন।'

গোরা বলিল,—'যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে—'

গোরা সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া নিমচাঁদ ও দেবেন্দ্র দত্তকে ঘাড় ধরিয়া তুলিল—বলিল,—'চল্—'

নিমচাঁদ বলিল,—'নিজে থেকেই যাচ্ছি বাবা—গলাটিপি দাও কেন? ওটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! To gild refined gold, to pain the lily, to throw a perfume on the violet—'

খট্ খট্! খট্ খট্! একটা বেসুরা শব্দে সকলে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, একজন বৃদ্ধ মুসলমান একটা লাঠি কাঁধে ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিতেছে এবং বিকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বারবার কি একটা বলিতেছে।

সকলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল; মোহগ্রস্ত বৃদ্ধ লাঠি কাঁধে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল,—'তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়!'

ক্রমশ পাগলা মেহের আলির কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল। আমার সম্মুখে যে-দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল তাহাও অল্পে অল্পে ফিকা হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কানের কাছে সেই উৎকট খট্-খট্ শব্দ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

টেব্‌ল হইতে মাথা তুলিয়া দেখি, বহির্দ্বারের কড়া সজোরে নড়িতেছে। চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

গৃহিণী থিয়েটার দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন।

ব্রজলাট

একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক কলিকাতার কোনও বিখ্যাত মাসিক পত্র ও পুস্তক প্রকাশকের বৃহৎ দোকান হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফাগুন মাসের অপরাহ্ণ তখন ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে, বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। যুবক ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিল, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অদূরে একটা রেস্তোরাঁ তাহার চোখে পড়িল। অধর দংশন করিতে করিতে সে হেঁটমুখে কি ভাবিল, তারপর সংযত পদে যেন অন্যমনস্ক ভাবে হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

যুবকের বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে সৌখীন বাবু বলিয়া বোধ হয়। গায়ে ধোপদস্ত সিল্কের পাঞ্জাবী, পরিধানে দিশী ধুতি। একটা কোঁচানো চাদর বগলের নীচে দিয়া বাঁ কাঁধের উপর ফেলা রহিয়াছে। তৈলহীন ঈষৎ রুক্ষ চুল সযত্নে কপাল হইতে পিছন দিকে বুরুষ করা। পায়ে পেটেণ্ট চামড়ার পাম্পসু। যুবকের মুখ বেশ সুশ্রী, একটুখানি পাতলা গোঁফ আছে। দেহ ছিপছিপে হইলেও সুগঠিত। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার মুখে একটা অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা ও শীর্ণভাব লক্ষিত হয়। কপালে ও চোখের কোলে চুলের মত সূক্ষ্ম রেখা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা অসংযত স্ফূর্তির তাগিদে দেহের উপর অতিরিক্ত অত্যাচার করে তাহাদের চোখে মুখে এইরূপ শ্রান্তির লক্ষণ প্রায়ই চিহ্নিত থাকিতে দেখা যায়।

যুবক অলস মন্থর পদে প্রায় রেস্তোরাঁর দ্বারের কাছে পৌঁছিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে কে বলিল, 'কি হে ব্রজলাট, কোথায় চলেছ?'

যুবক ফিরিয়া দেখিল—হিরণ। হিরণ পুঁটিমাছ শ্রেণীর একজন

সাহিত্যিক; বেশ ভূষা নিদারুণ দৈন্যের পরিচায়ক। গায়ের কামিজটা অত্যন্ত ময়লা, একটিও বোতাম নাই; চটিজুতার পশ্চাদ্ভাগ এতই ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছে যে পায়ের গোড়ালি ফুটপাথ স্পর্শ করিতেছে। তাহারও বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, মুখে একটা অতৃপ্ত অসন্তোষপূর্ণ বিদ্রোহের ভাব।

যুবকের পায়ের পাম্পস্থ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া হিরণ বলিল, 'কি বাবা, তরুণী মৃগয়ায় বেরিয়েছ? আজ শিকার কোনদিকে হে ব্রজলাট?'

ব্রজেন মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, 'তুমি কোন দিকে?' হিরণ হাসিয়া বলিল,—'মোল্লার দৌড় মসজিদ—আর কোনদিকে? বীরেনের আড্ডায় যাচ্ছি। যাবে নাকি?—না এনগেজমেণ্ট আছে?'

দু'জন পাশাপাশি চলিতে আরম্ভ করিল।

বীরেনের আড্ডা ক্ষুদ্র সাহিত্যিকদের একটা স্থায়ী মজলিশ। এখানে মা সরস্বতীর সঙ্গে মা লক্ষ্মীর চিরন্তন বিবাদের কথা বেশ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হইত, ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিলনা; এবং বীরেনের খরচে চা সিগারেট পান ধ্বংস করাই যে এ সভার মূল উদ্দেশ্য একথাও কেহ গোপন করিত না। বীরেন তাহা জানিত কিন্তু সেজন্য তাহার আতিথেয়তা কোনদিন সঙ্কুচিত হয় নাই। সে নিজে ঠিক সাহিত্যিক না হইলেও সাহিত্যের একজন পাণ্ডা ও সমজদার ছিল।

চলিতে চলিতে ব্রজেন হিরণের দিকে একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—'হিরণ, তোমার কামিজটা ধোপার বাড়ী দেওয়া দরকার বলে কি এখনো মনে হচ্ছে না?'

হিরণ নিজের দিকে একবার দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, 'হচ্চে। কিন্তু দেওয়া ঘটে ওঠেনি। কারণ কি জানো?—অর্থাভাব! কথাটার মানে তুমি বোধ হয় বুঝতে পারবে না, কিন্তু ওটা পৃথিবীতে আছে। ধোপা আমার অনেক কাপড় বিনা পয়সায় কাচবার পর এবার

জবাব দিয়েছে নগদ পয়সা না পেলে আর কামিজ কাচবে না।—কল্পনা করতে পার?' বলিয়া ব্যঙ্গপূর্ণ চক্ষে ব্রজেনের দিকে চাহিল।

ব্রজেন মুখ না ফিরাইয়াই বলিল,—'পারি। কিন্তু সে দোষ কি ধোপার?'

'না—আমার, কিম্বা আমার বাবার; তিনি আমার জন্যে যথেষ্ট টাকা রেখে যেতে পারেন নি। চাকরিও করি না—আমি সাহিত্যিক। যদি কেরাণী হতুম তা হ'লে বোধ হয় ফর্সা জামাকাপড় পরতে পেতুম। কিন্তু এতে আমার লজ্জা নেই ব্রজলাট—লজ্জা বরং তোমার।'

ভ্রূ তুলিয়া ব্রজেন বলিল, 'কিসে?'

'তুমি বাপের পয়সায় বাবুয়ানি করছ, আর যে তা পারে না তাকে বিদ্রূপ করছ। নিজের প্রতিভার জোরে টাকা রোজকার করে আমার মতন ফাতুস সাহিত্যিককে যদি ব্যঙ্গ করতে তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু সে প্রবৃত্তি তখন তোমার হত না।'

ব্রজেন বিরসকণ্ঠে বলিল,—'ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিছুই আমি করিনি। কিন্তু আমাদের—সাহিত্যিকদের—একটু আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা দরকার।'

হিরণ রাস্তার উপরেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'তুমি মনে কর তোমার চেয়ে আমার আত্মসম্মান জ্ঞান কম? ওটা তোমার ভুল। তুমি যাকে আত্মসম্মান মনে করেছ সেটা বস্তুত তোমার আর্থিক সচ্ছলতার অভিমান।'

হিরণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল,—'কিন্তু তুমি বুঝবে না ব্রজলাট। তুমি সৌখীন গল্প লেখ, ফুরফুরে কবিতা লেখ—ফোঁপরা ফুকো জিনিষ নিয়ে তোমার কারবার। ক্ষুধিতের মুখ যেখানে অন্নের দিকে চেয়ে হাঁ করে আছে, অভাব যেখানে মানুষের চরিত্র থেকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ মুছে ফেলেছে—আমরা গরীব সাহিত্যিক সেই

দিকটাই বেশী করে বুঝি। তাই ছেঁড়া কামিজে আমাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়না।'

'তা হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, গরীবের আত্মসম্মান আর ধনীর আত্মসম্মান আলাদা বস্তু নয়। বরং যে ব্যক্তি গরীব তার আত্মসম্মান জ্ঞান আরো বেশী থাকা দরকার।'

এইভাবে যখন তাহারা বীরেনের আড্ডায় পৌছিল তখন তাহাদের তর্ক কথার সংঘর্ষে অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বীরেনের ঘরে তক্তপোশের উপর গুটি পাঁচেক ছোকরা সাহিত্যিক বসিয়া ছিল; হিরণের উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল,—'কি হে হিরণ, বেজায় চটেছ যে। কথাটা কি?'

হিরণ বলিল,—'কথা সামান্যই। ব্রজলাটকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে পেটেণ্ট লেদার পাম্পস্ আর আত্মসম্মান এক বস্তু নয়।'

এ আড্ডার সকলেই ব্রজেনকে চিনিত এবং মনে মনে তাহার উপর বিরক্ত ছিল। ব্রজেনের সৌখীনতা ও চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে বিলাসিতার আভাস অন্য সকলকে খোঁচা দিয়া যেন তাহাদের জীবনের দৈন্য চেতনাকে প্রকট করিয়া তুলিত। তাহারাও পরিবর্ত্তে ব্রজেনকে শ্লেষ বিদ্রূপের বিষাক্ত কাঁটায় বিঁধিয়া প্রতিশোধ লইত। 'ব্রজলাট' নামটা এই কাঁটা গাছেরই ফুল।

প্রমোদ বলিল,—'ব্রজলাটকে সে-তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করোনা। যাদের অন্নবস্ত্রের কথা ভাবতে হয়না তাদের আত্মসম্মান ঐ জুতোর সুকতলাতেই আটকে থাকে।'

ব্রজেন সন্তর্পণে তক্তপোশের একপাশে বসিয়া বলিল,—'প্রমোদ, তোমার 'ইটখোলা' গল্পটা পড়লুম। কি রাবিশ লিখেছ? কতকগুলো কুলীমজুরের অসহায় দুর্দ্দশার কাহিনী লিখে কি লাভ হয় আমি ত বুঝতে পারি না। অবশ্য, তারা এই সব দুঃখ দৈন্য দমন করে মাথা তুলেছে—এ যদি দেখাতে পারতে তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু তারা দুর্ব্বল তারা নিপীড়িত তারা অভাবের পায়ে

মনুষ্যত্ব বলি দিচ্ছে—এই কথা জোর গলায় ঘোষণা করে কি লাভ হয় ?'

প্রমোদ গরম হইয়া বলিল,—'কি লাভ হয় ? মানুষের ব্যথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় ; যাদের প্রাণ আছে তারা বুঝতে পারে দেশের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা এই গরীবদের কি করে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে।'

ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল,—'এই গরীবদের দুর্দ্দশার জন্যে তাদের নিজেদের কোনো দায় দোষ নেই ?'

প্রমোদ গর্জ্জন করিয়া বলিল,—'না—নেই। দোষ তোমার মত বিলাসী ধনীর—যারা পরিশ্রম করেনা অথচ বসে বসে তাদের মুখের অন্ন কেড়ে খায়।'

ব্রজেন ধীরভাবে বলিল,—'আমি আজ পর্য্যন্ত কারুর মুখের অন্ন কেড়ে খেয়েছি বলে স্মরণ হচ্ছে না। তবে দু'একজনের মুখে অন্ন যুগিয়েছি বটে।'

অট্টহাস্য করিয়া প্রমোদ বলিল,—'তুমি দাতাকর্ণ! কার অন্ন কার মুখে যুগিয়েছ একবার ভেবে দেখেছ কি ?'

মৃদু হাসিয়া ব্রজেন বলিল,—'আমারই অন্ন, আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি।'

অন্নদা শান্ত বিজ্ঞতার কণ্ঠে বলিল,—'ব্রজলাট, গরীবের দরদ বুঝতে হলে গরীব হওয়া চাই—বুঝলে ? টাকার কাঁড়ির ওপর বসে থাকলে টাকার গরমে দরদ সব উবে যায়।'

ব্রজেন বলিল,—'তাই হবে বোধ হয়। তোমাদের ভাব দেখে মনে হয় টাকা জিনিষটাকে তোমরা ভারি ঘেন্না কর।'

প্রমোদ তীব্রস্বরে বলিল,—'হ্যাঁ করি। টাকা আমাদের হাতের ময়লা। আমি ত নিজে গরীব বলে গর্ব্ব অনুভব করি।'

ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল,—'গরীব হওয়ার কোনো বাহাদুরী আছে ?'

অন্নদা জবাব দিল,—'হ্যাঁ আছে। দেশের শতকরা নিরেনব্বই জনের মধ্যে আমিও একজন এই আমার গর্ব্ব।'

তাহার দিকে ফিরিয়া ব্রজেন বলিল,—'তুমি ত লটারিতে টিকিট কেনো সেদিন বলেছিলে। কেন কেনো? আর মনে কর যদি একলাখ টাকা পেয়ে যাও—সে টাকা কি ফেলে দেবে, না গরীবদের বিলিয়ে দেবে?'

অন্নদা হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। হিরণ তাহার হইয়া বলিল, 'অন্নদা কি করবে না করবে তা তুমি কি করে জানলে ব্রজলাট? বিলিয়েও দিতে পারে। আমি নিজের কথা বলতে পারি, টাকাকে আমি ঘেন্না করিনে বটে কিন্তু টাকা বুকে আঁকড়ে ধরবার মত জিনিষ তাও আমার মনে হয় না।'

ব্রজেন বলিল,—'আমারও হয় না, ওখানে আমি তোমার সঙ্গে এক-মত। কিন্তু তাই বলে নিজের দারিদ্র্যকে ঢাক পিটিয়ে জাহির করে বেড়ানোও আমি অত্যন্ত লজ্জাকর মনে করি।'

অন্নদার এতক্ষণে লুপ্ত কণ্ঠস্বর ফিরিয়াছিল, বলিল,—'কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে! He laughs at scars that never felt a wound.'

ব্রজেন বলিল,—'আচ্ছা অন্নদা, সত্যি বল, নিজেদের খেলো করতে একটুও বাধে না? এই যে তোমরা 'আমি হীন আমি দীন আমি নরকের কীট' বলে রাতদিন নাকে কান্না কাঁদছ, যে ছাইপাঁশ সাহিত্য রচনা করছ সেও ওই নাকি কান্নার সুরে—এতে তোমাদের মনের দৈন্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে না? এটা যে একটা inferiority complex তা বুঝতে পারছ না?'

অন্নদা উচ্চ অঙ্গের ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'না, পারছি না। আমরা তোমার মত snob নই। বীরেন, চা আনাও হে।'

ব্রজেনের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল,—'এই যে প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা নিয়ম বেঁধে বীরেনের ঘাড়

ভেঙে চা ইত্যাদি ধ্বংস করছ—এতেও নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে না?'

সকলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বীরেন লজ্জিতভাবে বলিল,—'আঃ কি বলছ ব্রজলাট! বন্ধুর বাড়ীতে—দোষ কি?'

ব্রজেন বলিল,—'দোষ হতনা, যদি এরা শুধু চায়ের লোভেই এখানে না আসত। মনের এই নির্লজ্জ দীনতাকেই আমি ঘেন্না করি।'

হিরণ বলিল,—'এখানে চা খেতে আসাই যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য তা সবাই জানে, বীরেনেরও অগোচর নেই। সুতরাং ব্রজলাট, তোমার খোঁচাটা মাঠে মারা গেল, আমাদের গায়ে লাগল না।'

ব্রজেন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'আশ্চর্য্য, এতবড় খোঁচাটাও তোমাদের গায়ে লাগল না! এত পুরু চামড়া নিয়ে তোমরা সাহিত্য রচনা কর কি করে?'

এই সময় চা আসিল। বীরেন বলিল,—'কিহে—উঠলে নাকি? এক পেয়ালা খেয়ে যাও।'

'না ভাই আমি উঠলুম। আমার একটু কাজ আছে।'

পেয়ালায় চুমুক দিয়া প্রমোদ হিংস্র কণ্ঠে কহিল, 'Firpoর চা নয়, ব্রজলাটের শরীর খারাপ হতে পারে।'

অন্নদা বাঁকা হাসিয়া বলিল,—'তা ছাড়া আত্মসম্মানের হানি হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু তোমার ত সে ভয় নেই ব্রজলাট, তুমি ত আর আমাদের মতন হা-ঘরে নয়। খাওনা এক পেয়ালা, আত্মমর্য্যাদা চিড় খাবে না।"

'না, তোমরা খাও'—বলিয়া ব্রজেন বাহির হইয়া যাইবে এমন সময় আরো দু'তিন জন আড্ডাধারী কলরব করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল।

বিরাজ বলিল,—'তুমুল ব্যাপার। হৈ রৈ কাণ্ড! আর

তোমাদের দুঃখ রইল না—বুঝলে হে? স্বয়ং কবি সম্রাট এবার আসরে নেমেছেন।'

সুধীর বলিল,—'কবি সম্রাটের মাথায় এত বুদ্ধি খেলত না বাবা, যদি এই শর্ম্মা দিনরাত পশ্চাতে লেগে থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাজ হাসিল না করত!'

বীরেন বলিল,—'কি ব্যাপারটা আগে বলনা ছাই।'

সুধীর বলিল,—'ব্যাপার আর কি! আমার সেই স্কীম মনে নেই? কবিকে রাজি করিয়েছি। সমিতি তৈরী হয়ে গেছে—স্বয়ং কবি তার সভাপতি। আরো অনেক বড় বড় শাঁসালো লোক আছেন। সমিতির নাম হয়েছে 'বাণী বান্ধব সমিতি'। ছোট বড় সব সাহিত্যিক আর সাহিত্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাঁদা তোলা হবে, বাইরে থেকে চাঁদা নেওয়া হবে না। সেই টাকায় তোমার আমার মতন যত সাহিত্যিক আছে—যাদের লেখা সহজে প্রকাশকেরা নিতে চায় না—তাদের বই ছাপিয়ে প্রকাশ করা হবে। এই দেখ আবেদন পত্র আর নামের ফিরিস্তি। স্বয়ং কবি গোড়াতেই দু'শো টাকার চেক্ ঝেড়েছেন।'

বিরাজ বলিল,—'শুধু তাই নয়, সমিতির অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যদি কোন সাহিত্যিক কষ্টে পড়েন, তাঁকে অর্থসাহায্যও করা হবে। —এখন যে যার ট্যাঁক থেকে কিছু কিছু বার কর ত দেখি। আমাদের ওপর চাঁদা তোলবার ভার পড়েছে!'

কবির স্বহস্ত লিখিত আবেদন পত্রটা সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেখা শেষ হইলে প্রমোদ প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'যাক বাবা, এতদিনে অনাথ শিশুদের একটা হিল্লে হ'ল। ওহে বিকাশ, তোমার সেই উপন্যাসখানা—যেটা আমাদের প্রায়ই পড়ে শোনাও—সেটা বগলে করে এবার বেরিয়ে পড়।'

সুধীর বলিল,—'সে ত পরের কথা, এখন কে কত দেবে বল। বীরেন, তুমি কি দিচ্ছ?'

বীরেন বলিল,—'আমি এক টাকা দিলুম। লিখে নাও।'

লিখিয়া লইয়া সুধীর বলিল,—'এবার তোমরা। অন্নদা—কত ?'

অন্নদা বলিল,—'আমরা আবার দেব কি বাবা ? আমরাই ত হলুম গিয়ে এ ফণ্ডের বেনিফিশিয়ারি—আমরা ত নেব।'

ব্রজেনের মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে বলিল,—'নেবে ? হাত পাততে লজ্জা করবে না অন্নদা ?'

প্রমোদ গাহিয়া উঠিল,—'কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ, সপ্তকোটি—'

সুধীর বলিল,—'ঠাট্টা নয়, টাকা বার কর। কবিকে কথা দিয়ে এসেছি।'

প্রমোদ বলিল,—'সুধীর তুমি হাসালে। আমরা টাকা কোথায় পাব ভাই! পকেটে স্রেফ সুপুরি আছে।—তার চেয়ে ঐ যে টাকার কুতুব মিনার দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে ধর। ওঁর হাত ঝাড়লে পর্ব্বত—এখনি দশ বিশ টাকা বেরিয়ে পড়বে।'

সুধীর ব্রজেনের দিকে ফিরিয়া বলিল,—'বেশ, তাহলে তুমিই আরম্ভ কর ব্রজলাট। কত দেবে ?'

ব্রজেনের মুখে একটা কঠিন হাসি দেখা দিল,—'আমাকেও দিতে হবে ? বেশ দু'টাকা লিখে নাও।' পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল,—'দুস্থ সাহিত্যিকদের প্রতিপালন করছি ভেবেও একটু আনন্দ পাওয়া যাবে।'

মনিব্যাগে কেবল একটি দশ টাকার নোট ছিল, ব্রজেন সেটা সুধীরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সুধীর বলিল,—'খুচরো টাকা ত নেই। তোমাদের কারুর কাছে আছে ? বীরেন, নোটখানা বাড়ী থেকে ভাঙিয়ে এনে দাওনা।'

প্রমোদ বলিয়া উঠিল,—'আবার ভাঙিয়ে কি হবে বাবা! ও সবটাই জমা করে নাও।'

সকলেই সানন্দে হাঁ হাঁ করিয়া সায় দিল, পরের টাকা সদ্ব্যয়

হইতেছে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয় ? বিশেষত আজ ব্রজেনের কথায় সকলের গায়েই বিষম জ্বালা ধরিয়াছিল। প্রমোদ বলিল,—‘ব্রজলাট, তুমি দশ টাকার কম দিলে লোকে বলবে কি ? তোমার সিল্কের পাঞ্জাবীর অপমান হবে যে বাবা। তাছাড়া তোমার নিজের উপার্জ্জনের পয়সা ত নয় যে গায়ে লাগবে। পৈত্রিক পয়সা—’

ব্রজেন তাহার দিকে ফিরিয়া তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—‘তুমি ঠিক জানো এ আমার পৈত্রিক পয়সা—কেমন ?’

প্রমোদ বলিল,—‘তাছাড়া আর কি হ’তে পারে লাট ? সাহিত্য ব্যবসায়ে উপার্জ্জন করে বাবুয়ানি কর এ ত বিশ্বাস হয় না।’

ব্রজেন আর কিছু বলিল না। সুধীর সানন্দে বলিল,—‘তাহলে দশ টাকাই জমা করে নিলুম।’

ব্রজেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ‘আচ্ছা চললুম’ বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

হিরণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—‘দাঁড়াও হে ব্রজলাট, আমিও যাব।—হাঁ হাঁ কিছু দেব বৈকি। আট আনা লিখে নাও, কিন্তু এখন কিছু দিতে পারছি না। শিগগির কিছু টাকা পাবার কথা আছে—’

দু’জনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ; ব্রজেনের বাসা কাশীপুরের দিকে সকলেই জানিত বটে কিন্তু কেহ আজ পর্য্যন্ত সেখানে পদার্পণ করে নাই। কিছুদূর গিয়া হিরণ জিজ্ঞাসা করিল,—‘বাসায় ফিরবে নাকি ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে তুমি বাস ধর, তোমাকে আর আট্‌কাব না।’

‘না আমি হেঁটেই যাব। চলনা যতদূর একসঙ্গে যাওয়া যায়।’

আরও কিছুদূর নীরবে চলিবার পর হঠাৎ হিরণ বলিল,—‘দেখ, তোমার কথাগুলো শুনতে কড়া হলেও সত্যি। কিন্তু কি করবো ভাই, পেরে উঠিনা। দাঁত চেপে দারিদ্র্য সহ্য করা সকলের সাধ্য নয়। তুমিও যদি আমাদের মতন অবস্থায় পড়তে—’

যে রেস্তোরাঁর সম্মুখে তাহাদের কথা হইয়াছিল সেখানে পৌঁছিয়া ব্রজেন দাঁড়াইয়া পড়িল। একবার টলিয়া নিজেকে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিল, তারপর হঠাৎ ফুটপাথের উপর সটান পড়িয়া গেল।

রেস্তোরাঁয় লোক ছিল, ব্রজেনের মূর্চ্ছিত দেহ ধরাধরি করিয়া একটা বেঞ্চির ওপর শোয়াইয়া দিল। হিরণ একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, সে বলিল,—'কিছুই ত বুঝতে পারছি না। হঠাৎ,—মৃগীর রোগ আছে হয় ত। অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলে ভাল হয়।'

অ্যাম্বুলেন্স আসিলে ব্রজেনকে তাহাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। হিরণও সঙ্গে গেল।

* *

হাঁসপাতালের ডাক্তার ব্রজেনের পরীক্ষা শেষ করিয়া হিরণের কাছে আসিয়া বলিলেন,—'আপনার বন্ধু ? না এখনো জ্ঞান হয়নি ; তবে শিগগির হবে আশা করি।—ওঁকে দেখে ত বেশ সঙ্গতিপন্ন বলেই মনে হল। অথচ—আশ্চর্য্য—উনি বোধ হয় একমাস কিছু খাননি। শরীরের টিস্যুগুলো পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে।···কি ব্যাপার বলুন ত ?'

আদিম নৃত্য

পুরুষ-মাকড়সা প্রেমে পড়িলে প্রেয়সীর সম্মুখে নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। কিন্তু মিলন ঘটিবার পর নৃত্য করিবার মত মনোভাব আর তাহার থাকে না! প্রেমমুগ্ধা স্ত্রী-মাকড়সা তাহাকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

যাহার আটটা পা এবং ষোলটা হাঁটু আছে, সে যে সুযোগ পাইলেই নৃত্য করিবে তাহাতে বিস্ময়কর কিছু নাই। পরন্তু অতগুলা পা ও হাঁটু না থাকা সত্ত্বেও মানুষ অনুরূপ অবস্থায় ঠিক অনুরূপ কার্য্যই করিয়া থাকে। ডারুইন মহাশয়ের কথা সত্য হইলেই স্বীকার করিতে হয় মাকড়সার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে; হয়ত নারীজাতির সামনে নৃত্য করিবার স্পৃহা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি; এবং নারীজাতিও যখন আমাদের সঙের মত নৃত্য দেখিয়া বেবাক গ্রাস করিয়া ফেলে তখন তাহারা তাহাদের আদিম অতিবৃদ্ধ পিতামহীর মৌলিক বৃত্তিরই অনুসরণ করে।

কিন্তু এসব বাজে কথা। কাজের কথা এই যে, আমরা অহরহ নানা কলাকৌশল দেখাইয়া ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ধাপ্পা টিকিতেছে না, নারীর মোহমুক্ত চোখে বারম্বার ধরা পড়িয়া যাইতেছে। উদয়শঙ্করের গলায় যিনি মাল্য দিবেন তিনি জানিয়া বুঝিয়াই দিবেন।

শ্রীমতী লূতারাণী ও শ্রীমান বীরেশ্বরের মধ্যে প্রণয় ঘটিত একটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রেমের প্রতিবন্ধক—আর্থিক সামাজিক ঐহিক দৈহিক পৈত্রিক বা পারত্রিক কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু প্রতিবন্ধক না থাকিলেই যদি মিলন ঘটিত তবে আর ভাবনা ছিল কি?

যা হোক, কবির ভাষায়—

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।

লূতা কলিকাতায় পিতৃভবনরূপ স্বর্ণপিঞ্জরে কালচারের ঝাললঙ্কা লালঠোঁটে ধরিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার করিত, এবং জমিদারের ছেলে বীরেশ্বর বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইত। সহসা কি করিয়া দুইজনে দেখাশুনা হইয়া গেল। তারপরই উক্ত প্রণয় ঘটিত জটিলতা এবং তারপরেই বীরেশ্বর লূতার সম্মুখে—মেটাফরিক্যালি—নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

লূতার ঠোঁটে হাসি, চোখে কৌতুক; সে এই নৃত্য উপভোগ করিতেছে, কদাচিৎ হাততালি দিয়া তাহা জানাইয়া দেয়। উৎসাহিত বীরেশ্বর আরও বেগে নৃত্য করে। নাচিতে নাচিতে লূতার কাছ ঘেঁষিয়া আসে কিন্তু লূতা মৃদু হাসিয়া অলক্ষিতে সরিয়া যায়। নর্ত্তক ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়—কমে না।

কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমে মেটারলিঙ্কীয় রূপকের মত দুর্ব্বোধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্পষ্টভাষায় না বলিলে চশমা পরা অস্পষ্টদর্শী পাঠক বুঝিবেন না।

একদিন সন্ধ্যার পর লূতাদের ড্রয়িংরুমে লূতা ও বীরেশ্বর বসিয়া ছিল; লূতার ডাক্তার বাবাও এতক্ষণ ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ফোনে রোগীর আহ্বান পাইয়া তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বীরেশ্বর উঠিয়া আসিয়া লূতার পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, ঢিলা আস্তিনের ভিতর হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া কব্জি সমেত বাহুর খানিকটা দেখা যাইতেছে। সে ঈষৎ হস্তসঞ্চালনে বাহুর আরও খানিকটা মুক্ত করিয়া দিয়া অলসকণ্ঠে বলিল,—'আজ ব্যায়াম সঙ্ঘের মিটিঙে বক্তৃতা দিতে হ'ল।'

বিস্ময়-প্রশংসা-তরলিত স্বরে লূতা বলিল, 'আপনি বক্তৃতা দিতেও পারেন?'

একটু হাসিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'পারি যে তা নিজেই জানতুম না ; কিন্তু বলতে উঠে দেখলুম পারি।'

'কি বক্তৃতা দিলেন ?'

'এই স্বাস্থ্য, ব্যায়াম, শিকার সম্বন্ধে দু'চার কথা। সকলেই বেশ মন দিয়ে শুনলে।'

লূতা বলিল, 'আপনি শুনেছি একজন মস্ত শিকারী। কি শিকার করেন ?'

বীরেশ্বর তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'বাঘ ভালুক—তা ছাড়া আর কি শিকার করব! সিংহ ত আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।'

উৎসুকভাবে লূতা জিজ্ঞাসা করিল, 'কটা বাঘ মেরেছেন ?'

'গোটা আষ্টেক হবে।—আমার বাড়ীতে যদি কখনও যাও, দেখবে তাদের মুণ্ডুসুদ্ধ চামড়া আমার ঘরে সাজানো আছে। যাবে লূতা ? একদিন চল না।'

লূতা হাসিল। প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল, 'আপনার খুব সাহস—না ?'

ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'সাহস! কি জানি। আছে বোধ হয়। কখনও ভয় পেয়েছি বলে ত স্মরণ হয় না। তারপর লূতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এবার তোমার জন্যে একটা বাঘ মেরে নিয়ে আসব, কি বল ?'

লূতা আবার হাসিল ; উজ্জ্বল চপল হাসি। বলিল, 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ',—লূতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বীরেশ্বর বলিল,—'বাঘের বদলে তুমি আমায় কি দেবে বল।'

আস্তে আস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া লূতা বলিল, 'কি দেব ? বাঘের বদলে কি দেওয়া যেতে পারে ? আচ্ছা, আপনাকে ভাল একটা প্রশংসাপত্র দেব।'

'তার বেশী আর কিছু নয় ?'

লূতা মুখটি ভালমানুষের মত করিয়া বলিল, 'প্রশংসাপত্রের

চেয়ে বেশী আর আপনার কি চাই? ওর চেয়ে বড় আর কি আছে!'

বীরেশ্বর ক্ষুণ্ণ হইল, ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আজ উঠতে হল, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। পঞ্চাশ মাইল স্পীডে মোটর চালিয়ে যদি যাই, তবু বাড়ী পৌঁছতে দু'ঘণ্টা লাগবে।'

গাড়ীবারান্দার সম্মুখে আয়নার মত ঝকঝকে দীর্ঘাকৃতি একখানা মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, লূতা বীরেশ্বরকে বিদায় দিতে আসিয়া বলিল, 'কি চমৎকার গাড়ী! নতুন কিনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। বারো হাজার টাকা দাম নিলে। মন্দ নয় জিনিষটা।'

তারপর বীরেশ্বর বোধ হয় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। লূতা ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার মুখে মনালিসার গূঢ় রহস্যময় হাসি।

ও হাসিটা কিন্তু মনালিসার নিজস্ব নয়; সকল নারীই সময় বুঝিয়া ঐরকম হাসিয়া থাকে।

লূতার বাবা ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বীরেশ্বর চলে গেছে?'

'হ্যাঁ'—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া লূতা বলিল, 'বীরেশ্বর বাবুর মতন এমন সর্ব্বগুণমণ্ডিত লোক দেখা যায় না। তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন, বাঘ মারতে পারেন, পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ী চালাতে পারেন, শুধু নাচতে পারেন কিনা এ খবরটা এখনও পাইনি। বাবা, বীরেশ্বর বাবুর ভেতরের সত্যিকার মানুষটি কেমন?'

বাবা চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'জানি না।'

লূতার চোখদুটি এবার ক্রুদ্ধ ও সজল হইয়া উঠিল—কেন ওরা কেবলি অভিনয় করে! কেন এত যত্ন করিয়া সত্যকার মানুষটিকে লুকাইয়া রাখে? ছদ্মবেশের এই ভাঁড়ামি দেখিয়া লূতার লজ্জা করে, আর তাহাদের নিজের লজ্জা নাই?

কিন্তু লতা মুখে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

দিন সাতেক পরে বীরেশ্বর ফিরিল। তাহার মোটরের পিছনে একটা প্রকাণ্ড বাঘের মৃতদেহ বাঁধা।

লূতা দ্বিতলের জানালা হইতে দেখিয়াছিল, কিন্তু নামিয়া আসিতে বিলম্ব করিল। যখন নামিল তখন বীরেশ্বর তাহার বাবার কাছে বাঘশিকারের গল্প করিতেছে।

লূতাকে দেখিয়া বীরেশ্বর বলিল,—'তোমার বাঘ এনেছি।'

লূতা স্ত্রীজাতি, সে বিস্ময় প্রকাশ করিল। তারপর কৌতূহল, ও শেষে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া বীরেশ্বরের বীরত্বের মূল্য অযথা বাড়াইয়া দিল। বাঘ পরিদর্শন হইল। তারপর বীরেশ্বর আবার বাঘশিকারের গল্প আরম্ভ করিল।

লূতার বাবা কাজের লোক, ক্রমাগত বাঘশিকারের গল্প শুনিবার তাঁহার অবকাশ নাই। তিনি এক ফাঁকে অপসৃত হইয়া পড়িলেন।

কাহিনী শেষ করিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'এবার তোমার বাঘ তুমি নাও।'

লূতা বলিল, 'আমার বাঘ! বাঘের গায়ে কি আমার নাম লেখা আছে?'

'নাম লিখতে আর কতক্ষণ লাগে। বল ত এখনি—'

'তার দরকার নেই।—লাকি-বোন্‌টা আমায় দেবেন।'

বীরেশ্বর লূতার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'লতা, এবার তোমার পালা। তুমি আমায় কি দেবে?'

হাত টানিয়া লইয়া লূতা বলিল,—'ও—ভুলে গিয়েছিলুম। দাঁড়ান, প্রশংসাপত্রটা লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলিয়া সহাস্য মুখে উপরে চলিয়া গেল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐহিক এবং দৈহিক, পৈত্রিক এবং পারত্রিক প্রতিবন্ধক না থাকিলেও প্রণয়ের পথ কণ্টকাকীর্ণ। ক্রুদ্ধ বীরেশ্বর বাঘ লইয়া ফিরিয়া গেল এবং দশদিন ধরিয়া মেজাজ এমন

তিরিক্ষি করিয়া রাখিল যে আত্মীয় পরিজন সকলেই সন্দেহ করিল মৃত বাঘের প্রেতাত্মা তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে।

কিন্তু এগারো দিনের দিন হঠাৎ তাহার রাগ পড়িয়া গিয়া আবার নৃত্যলিপ্সা জাগিয়া উঠিল।

সে টেলিফোনে লূতাকে ট্রাঙ্ক-কল দিল। ওদিকে এই দশ দিনে লূতাও কিছু ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল। নৃত্য দেখিলে রাগ হয়, আবার না দেখিলেও মন খারাপ হইয়া যায়—ইহাই নারীজাতির স্বভাব।

বীরেশ্বর টেলিফোনে বলিল, 'তোমার লাকি-বোন্ তৈরী হয়ে এসেছে।'

উদ্‌গ্রীব স্বরে লূতা বলিল, 'তৈরি হয়ে এসেছে! কোথা থেকে?'

'স্যাকরা-বাড়ী থেকে। একটা ব্রোচ। পাঠিয়ে দিতে পারি?'

লূতার কণ্ঠ মধুর হইয়া উঠিল,—'আপনার বুঝি কাজ আছে? নিজে আসতে পারবেন না?'

'কাজ!' বীরেশ্বর লাফাইয়া উঠিল, 'তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

'তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। কেন?'

'আচ্ছা, চারটে বেজে পাঁচ মিনিটে আমি গিয়ে পৌঁছুব।'

'অ্যাঁ! এক ঘণ্টায় সত্তর মাইল! না—না—'

কিন্তু বীরেশ্বর আর কিছু শুনিল না, টেলিফোন ফেলিয়া গ্যারাজের দিকে ছুটিল।

ঠিক চারটে বাজিয়া তিন মিনিটে লূতাদের বাড়ীর সম্মুখে একটা বিরাট শব্দ হইল। লোমহর্ষণ কাণ্ড! সত্তর মাইল নিরাপদে আসিয়া বীরেশ্বরের মোটর লূতার দ্বারের কাছে চিৎ হইয়া পড়িয়াছে। একটা লোহাবোঝাই তিন টন্ লরী যাইতেছিল, তাহারই সহিত ঠোকাঠুকি।

মোটরের তলা হইতে বীরেশ্বরের সংজ্ঞাহীন দেহ বাহির করা

হইল, তারপর ধরাধরি করিয়া লূতাদের বাড়ীতে তোলা হইল। বাড়ীতেই ডাক্তার। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই। মুখের আঁচড়গুলো মারাত্মক নয়; তবে বাঁ পায়ের টিবিয়া ভেঙে গেছে।' বলিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ইন্‌জেকশন্ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

লূতা জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রাণের ভয় নেই ?'

'নাঃ। কিছুদিন বাবাজীকে একটু খুঁড়িয়ে চলতে হবে—এই পর্য্যন্ত।'

বীরেশ্বরের নৃত্য-জীবনের যে এই সঙ্গে অবসান হইয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না।

এক ঘণ্টা পরে বীরেশ্বরের জ্ঞান হইল। তখন সে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ লইয়া বিছানায় শুইয়া আছে। লূতা তাহার পাশে একটি টুলের উপর উপবিষ্ট।

লূতা জলভরা চোখে বলিল, 'কেন এত জোরে গাড়ী চালিয়ে এলেন ? না হয় দু' ঘণ্টা দেরী হত ?'

চিরন্তন প্রথামত বীরেশ্বর 'আমি কোথায়' বলিল না। বলিল, 'আমার সারা গা এত জ্বালা করছে কেন ?'

লূতার বুক দুলিয়া উঠিল, সে বলিল,—'টিঞ্চার আয়োডিন।'

বীরেশ্বর বলিল, 'আমার মুখখানা কি কেটেকুটে একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ—কিন্তু ও কিছু নয়। বাবা বললেন সেরে যাবে।'

বীরেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, 'আর কি হয়েছে ?'

'আর বাঁ পায়ে ফ্র্যাক্‌চার হয়েছে।'

মর্ম্মভেদী স্বরে বীরেশ্বর বলিল, 'চিরজীবনের জন্যে খোঁড়া হয়ে গেলুম।'

লূতা উদ্বেলিত হৃদয়ে চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বীরেশ্বরও চুপ করিয়া রহিল; তারপর তাহার মুদিত চোখে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে চোখ বুজিয়াই বলিল,—'লূতা, আমরা ভারি বোকা।'

লূতা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

বীরেশ্বর বলিতে লাগিল, 'কেন? আমরা যাকে ভালবাসি তাকে ভালবাসার কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার মনে করি না—কেবল নিজের যোগ্যতাই প্রমাণ করতে চাই। তাই, আজ বলবার অবকাশ যখন হল তখন আর সে-কথা মুখ থেকে বার করবার উপায় নেই।'

মৃদুস্বরে লূতা বলিল,—'কেন উপায় নেই?'

অধীর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বীরেশ্বর বলিল, 'বোকার মত কথা ব'লো না লূতা। কি হবে বলে? বললেই বা শুনবে কে? ভাঙা বাঁশীর বেসুরো আওয়াজ কার শুনতে ভাল লাগে!"

লূতা বলিয়া উঠিল, 'আমার ভাল লাগে—তুমি বল।'

'লতা!' বীরেশ্বর প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

বাঁশী ভাঙিয়াই যে তাহার বেসুরা আওয়াজ সুরে ফিরিয়া আসিয়াছে, লূতা তাহা বলিল না। সে উঠিয়া বীরেশ্বরের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মস্তকটি বুকের মধ্যে জড়াইয়া লইল, 'অত চেঁচিও না—পাশের ঘরে বাবা আছেন। এতদিন খালি ছেলেমানুষী করলে কেন? কেন নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে এত দেরী করলে?'

কিন্তু বীরেশ্বরের সত্যিকার পরিচয় দেওয়া তখনও শেষ হয় নাই। সে কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর চাপা যন্ত্রণার সুরে বলিয়া উঠিল, 'লূতা, মাথা ছেড়ে দাও—উঃ—উঃ অত জোরে চেপো না—বড্ড লাগছে—'

লূতারাণী দুর্ব্বল অসহায় পুরুষকে তাহার বুভুক্ষু বক্ষে গ্রাস করিয়া লইল। এইরূপে প্রকৃতির আদিমতম বিধান সার্থক হইল এবং প্রত্যহ হইতেছে।

শেষ